কাগজের নৌকা

বাতায়ন

নতুন ভুবনের পারে

Durba

Srijato

Tanmoy

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২৩তম সংখ্যা, জুলাই ২০২৩

সম্পাদনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

বাতায়ন

Issue Number 23 : July, 2023

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Suvra Das **Front Cover**

Shuvra Das is a Professor of Mechanical Engineering and lives in the greater Detroit area. He graduated from IIT Kharagpur in India and finished his PhD from Iowa State University. Photography, painting, writing, theater, and travel are some of his passions. Lately, he has been spending a lot of time in political activism.

Saumen Chattopadhyay **Title Page**
IL, USA Venice is pretty

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

মিস এলিনর ক্রেসির কথা অনেকেই হয়তো জানেন না। ১৮৫১ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে তৈরী হওয়া জাহাজ, ফ্লাইং-ক্লাউডের নেভিগেটর ছিলেন এই অদম্য সাহসী মহিলা। সেই যুগে এই পেশায় তিনি ছিলেন পৃথিবীতে একমাত্র মহিলা যা ছিল অভাবনীয়। তার দক্ষতায় ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকোতে প্রয়োজনীয় রসদ পৌঁছে দিতো জাহাজ।

প্রকাশিত হলো কাগজের নৌকার ২৩তম সংখ্যা। কত অনলাইন ম্যাগাজিন সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাগজের নৌকা আজও সাঁতরে এসে নোঙর ফেলছে পথ চেয়ে থাকা পাঠকের মনের বন্দরে। পৌঁছে দিচ্ছে মননশীলতার রসদ, উপন্যাস, ধারাবাহিক, অনুবাদ, বড়গল্প সমেত, সাথে রয়েছে নতুন কবিতার আত্মপ্রকাশ। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে বলেছিলেন "It is good to have an end to journey toward; but it is the journey that matters, in the end."

সেই কথা মাথায় রেখে লেখার সঙ্গে পাঠকের মেলবন্ধনের যাত্রায় সামিল কাগজের নৌকা। এলিনর ক্রেসির পৃথিবীর প্রথম মহিলা নেভিগেটরের খেতাব অক্ষুণ্ন ছিলো ১৮৫৪ থেকে ১৯৮৯ অব্দি, প্রায় একশো বছরেরও বেশী সময় ধরে। আশা করবো পাঠকের মনে বরাবরের মতো এবারও কাগজের নৌকার ২৩তম সংখ্যার জায়গা প্রিয় পত্রিকার জায়গা হিসেবে অক্ষুণ্ন থাকবে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	**ছায়া সীমানা**	6
সৌমিত্র চক্রবর্তী	**সময়**	19
স্বপ্না মিত্র	**পাহাড় চুড়ো**	33

কবিতা

নবনীতা দেবনাথ	**আকাশকুসুমগন্ধি যারা**	5

গল্প

স্বর্ণালী সাহা	**কফির মৌতাতে আড্ডা**	40
রজত ভট্টাচার্য্য	**২০৫০**	48
অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়	**মেজদার হোটেল** **(কমলকুমার মজুমদার –** **এক ইউরোপীয় ব্রাহ্মণকে ফিরে দেখা)**	66

পুনরীক্ষণ

স্বপন ভট্টাচার্য	**গ্যালিয়ানোর আয়না ও অন্যান্য কবিতা** **পুনরীক্ষণ: পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী**	42

অনুবাদ

উদ্দালক ভরদ্বাজ	**সোফিয়া** **(মূল রচনা: জোয়ান লগহি (Joan Logghe):** **লা পুয়েবলা, নিউ মেক্সিকো)**	44

নবনীতা দেবনাথ

আকাশকুসুমগন্ধি যারা

রূপকথাদের রাজধানী মন
যখন তখন
একলাযাপন, পেরিয়ে এলে
তোমার সাথে হাঁটতে বেরোয়;
লেখার যত বায়নাবাজি
মস্ত পাজি
মরতে রাজি, শব্দেরা সব
তোমার বাড়ির রাস্তা পেরোয়।

আকাশকুসুমগন্ধি যারা
বাস্তুহারা
মন বাহারা, তারাই আমার
অবুঝ মনের সঙ্গী যত;
হঠাৎ হঠাৎ থমকে যেতে
রাতবিরেতে
তোমায় পেতে, ইচ্ছে হলে
শব্দ বুনি নিজের মতো।

দমকা হাওয়ার হিমেল শীতে
অতর্কিতে
সবুজ ফিতের, অতীত যদি
ফিরেই আসে শেষ বিকেলে;
হালকা ডানা কাঁধের পাশে
সর্বনাশে
মুচকি হাসে, চোখের কোণে
উপন্যাসের ছোঁয়াচ পেলে।

সময় তবে সম্মতি পাক
বন্ধু পাতাক
অসুখ সারাক, অল্প আঁচে
উচ্ছলতার উষ্ণতারা;
হাতের মুঠোয় কোকুন বুনি
ইচ্ছে গুনি
হঠাৎ শুনি, ডাকছে আমায়
ভীষণ নিজের একটা তারা।।

নবনীতা দেবনাথ – উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। আদ্যন্ত প্রকৃতিপ্রেমী ও পশুপ্রেমী হয়েও নিজেকে খুব সাধারণ একটি মেয়ে হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। লেখালেখির সঙ্গে নবনীতার সখ্যতা ছোটবেলা থেকেই। প্রচারবিমুখ কবিতাযাপনে তিনি খুঁজে নেন জীবনের অনন্ত সুধা। নবনীতার ভাষায় "লেখারা আমার কাছে ঠিক যেন ওই দক্ষিণের জানালার মতো, খুলে দিলেই ওপারে অনন্ত আকাশ"। জীবনের রোজনামচা থেকেই কুড়িয়ে নেওয়া তার মুহূর্ত-ঝিনুক, তারপর যত্নে জুড়ে দেওয়া শব্দ ও অনুভবের সাথে, এবারের (বাতায়ন/কাগজের নৌকা) সাথে।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া সীমানা

পর্ব ৪

(৯)

কোলকাতা থেকে দিল্লি ফিরে এসে অবধি শর্মিলার অস্থিরতা যেন অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। সারাটা দিন হাসপাতালে কাজ, সহ-কর্মীদের সঙ্গ এবং সারা সন্ধ্যে ক্লাবে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ডিনর আর আড্ডা সেরে অনেক রাত করে যখন বাড়ি ফেরে, চতুর্দিক থেকে ঘন কালো শূন্যতা এসে তাকে ঘিরে ফেলে। নিশ্ছিদ্র সেই শূন্যতার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার উপায় শর্মিলার জানা নেই।

বেঁচে থাকার উদ্দীপনা, আকর্ষণ এবং উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে শর্মিলা।

অথচ মাত্র কয়েক বছর আগেও তো কদাপি এরকমটা মনে হত না শর্মিলার। অস্ট্রেলিয়াতে ছাত্র জীবন যখন কাটছিল ওর, তখন জীবন মানেই ছিল একদল স্তাবকের মাঝে মক্ষীরানি হয়ে থাকা। নিত্য-নতুন প্রেমে পড়া এবং প্রেমিকদের সঙ্গে নানা রংয়ের অ্যাড্‌ভেঞ্চারে মেতে থাকার নেশায় আবিষ্টতা।

তারপর দিল্লি ফিরে এসে নতুন কাজে যোগ দিল। আবার নতুন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ হল। কয়েকজন স্তাবকদের নিয়ে শর্মিলার একটা ফ্যান-ক্লাবও সবে তৈরি হচ্ছিল। আর ঠিক তখনি সুশান্ত রয়ের আবির্ভাব ঘটল ওর জীবনে। তীব্রভাবে সে আকর্ষণ করেছিল শর্মিলাকে। সুশান্ত শুধুমাত্র হ্যান্ডসামই ছিল না, সুশান্ত শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিতই ছিল না, সুশান্ত শুধুমাত্র মেগারিচ ইন্‌ডাস্ট্রিয়লিস্টের একমাত্র সন্তানই ছিল না, সুশান্ত ছিল অনমনীয়, অদম্য এবং অপরাজেয়। সেই অনমনীয়তা, সেই অদম্যতা এবং অপরাজেয়তাই চুম্বকের মত আকর্ষণ করল শর্মিলাকে। পারিপার্শ্বিক সব কিছু বিস্মৃত হয়ে সে সুশান্তকে জয় করে নেবার নেশায় মেতে উঠল।

ওদের বিয়ের পরও সুশান্তর প্রতি শর্মিলার সেই আকর্ষণ অটুট রইল। যতই ওকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইল সুশান্ত, ততই ওকে নিজের কাছে টেনে আনার ব্যগ্রতায় বেপরোয়া হয়ে উঠল শর্মিলা। একদিন যে সুশান্ত ওর একান্ত ঘনিষ্ঠ হবে, এই বিশ্বাসে শর্মিলা তখনো অনড়।

কিন্তু, ট্যামারিন্ড কোর্ট বারের সেই হত্যাকান্ড রাতারাতি সব কিছু ওলট-পালট করে দিল। তারপর কোথায় যে উধাও হয়ে গেল সুশান্ত! তার সঠিক হদিশ আজও শর্মিলার অজানা। সুশান্তর কথা মনে পড়লে এক অব্যক্ত ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে শর্মিলার বুক।

অথচ সুশান্তর ফিরে আসার অপেক্ষায় আজীবন বসে দিন গুনতেও প্রস্তুত নয় শর্মিলা। একাকী জীবন ক্রমশঃ দুর্বিসহ হয়ে উঠতে থাকে ওর কাছে।

এমনি এক সময়ে, ঘন অন্ধকারে, গভীর শূন্যতায় এবং একাকীত্বের হাহাকারে যখন পূর্ণ হয়ে উঠছিল শর্মিলার জীবন, সঞ্জয়ের সঙ্গে হঠাৎ শান্তি নিকেতনে দেখা হয়ে গিয়েছিল।

সঞ্জয়ের উপেক্ষা আর উদাসীনতা আহত করেছিল তাকে। সেই মুহূর্ত থেকেই ওর মনে হতে লাগল, সঞ্জয়কে ঘনিষ্ঠভাবে, নিজের করে পেতেই হবে। সঞ্জয়কে ওর জিতে নিতেই হবে এবার। শর্মিলাকে অবহেলা করে, বৌ নিয়ে সুখে ঘর করবে সঞ্জয়, এ অসম্ভব। ওর সুখের সংসারকে উজাড় করার জন্য যতটা নীচে ওকে নামতে হয়, শর্মিলা নেমে আসবে। এভ্‌রি থিং ইজ ফেয়ার ইন্ লভ্ অ্যান্ড ওয়ার !

শেষে সিদ্ধার্থর সঙ্গে যোগাযোগ করে ও জানতে পারল যে সঞ্জয় এখন কাশী ইউনিভর্সিটির বায়ো মেডিকাল ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে অধ্যাপনা করছে। এরপর বেনারস হিন্দু ইউনিভর্সিটির ঠিকানা যোগাড় করে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়। হলও না। শর্মিলা আর কালবিলম্ব না করে একটা চিঠি লিখতে বসল।

ওদের বিয়ের মাস সাতেকের মুখেই ঘটেছিল ঘটনাটা। দিনের শেষে, বাড়ি ফেরার আগে, অফিসের টেবিলের ওপর সেদিনের ডাকে-আসা চিঠিপত্রগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে নীল খামখানা হাতে পড়ল সঞ্জয়ের। খামের ওপর অতি পরিচিত হাতে ওর নাম এবং ঠিকানা লেখা। এক সময়ে এই হাতে লেখা খাম পেলে ওর সারা দেহে আনন্দের শিহরণ জাগত। ভালো লাগার স্পন্দন অনুভব করত সারা দেহে। অথচ, সেদিন খামের ওপর অতি পরিচিত সেই হাতে লেখা নিজের নামটা দেখে অজানা এক ভয়ে আতঙ্কিত হল সঞ্জয়। কম্পিত-হস্তে খামখানা খুলে ফেলল সে। সুন্দর, নিটোল মুক্তোর অক্ষর ছড়ানো নীল কাগজটার ওপর। রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলল চিঠিটা অতঃপর –

ডার্লিং বন্ধু সঞ্জয়,

তোমার কথা বড্ড বেশী মনে পড়ে আজকাল।

সেদিন শান্তি নিকেতনে হঠাৎ তোমার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল তোমার আনকোরা নতুন বৌরানী। বেশ নরম-সরম। পুতুল-পুতুল চেহারা। স্বীকার করতেই হয়েছিল যে বৌটি তোমার ভালই হয়েছে। দেখে মনে হয়েছিল ভারি পতি-প্রাণা, সতী-সাধ্বী মেয়ে। এক্কেবারে আমার বিপরীত, যাকে একদিন বিয়ে করার জন্য তুমি পাগল হয়ে উঠেছিলে। অবশ্য মধ্যবিত্ত নৈতিক মূল্যবোধে বড় হয়ে ওঠা তোমার মত একজন যে সতী-সাধ্বী স্ত্রীকে নিয়ে পরম সুখে, শান্তিতে ঘর করবে, এ আর বিচিত্র কি!

কিন্তু সঞ্জয়, আমার যে প্রতি নিয়ত তোমার কথা মনে হয়। মেলবোর্নে আমাদের একসঙ্গে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতি যখন তখন ভেসে ওঠে চোখের সমুখে। তুমি যে আমাকে এক সময়ে মনে-প্রাণে ভালবেসেছিলে, তোমার সর্বস্ব দিয়ে আমাকে তোমার করে নিতে চেয়েছিলে অথচ আমিই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, একথা ভেবে আমার মন অহরহ অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। সঞ্জয় আজ আমি বড় একা। তাই ভাবছি, তুমি কি বন্ধু হয়ে আর একবার আমার পাশে দাঁড়াবে ? বিশ্বাস করো, তোমার কাছ থেকে আজ শুধু তোমার বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই আমি প্রত্যাশা করি না আজ। শুধু তোমার বন্ধুত্বের হাত – এগিয়ে দিতে পারবে না, সঞ্জয় ? আমার এই দুর্দিনে ?

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় আমি দিন গুনব।

অনেক ভালবাসা রইল তোমার জন্য –

শর্মি

কম্পিত হস্তে খামটা খুলে শর্মিলার চিঠিখানা পড়ে দারুণ দোটানায় পড়ে গেল সে। কি করবে সে এবার!

স্টাফ্ রুম থেকে এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে সে আবার ফিরে এলো অফিসে। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে, চেয়ারে বসে সে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

শর্মি একা! শর্মি গভীর অবসাদে ভুগছে! কিন্তু কেন! ওর মত অমন একটা প্রাণোচ্ছল মেয়ের জীবনে কি এমন সমস্যা এলো যে আজ সে অমন নিঃসঙ্গতায় ভুগছে! এই তো সেদিন বিয়ে হল ওর, সিদ্ধার্থর কাছে খবর পেয়েছিল সঞ্জয়। তাহলে? শর্মির প্রাক্-বৈবাহিক যুগের কোন অ্যাফেয়রের কথা কি জানতে পেরেছিল ওর স্বামী? আর তাই কি সে শর্মিকে ছেড়ে চলে গিয়েছে? কে জানে! অথচ হাই সোসাইটিতে বড় হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা মিড্‌ল ক্লাস মরালিটি নিয়ে মাথা ঘামায় না! অন্ততঃ

শর্মির অতি সাহসী, অতিরিক্ত খোলামেলা কথাবার্তা এবং মন্তব্যগুলোর মধ্যে সঞ্জয় সেরকম আভাসই তো পেয়েছিল। কিন্তু সঞ্জয় এখন কি করবে? শর্মির চিঠির উত্তরে সে কি লিখবে? কিংবা আদৌ সে চিঠির উত্তর দেবে কি? আর তার চেয়ে বড় কথা, শ্রীকে কি শর্মির সঙ্গে ওর পূর্ব প্রণয়ের কথা খুলে বলবে! কিন্তু সেখানেও যে সঞ্জয়ের দোটানা! এই ক'মাস ওর সঙ্গে বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে কাটিয়ে ও বুঝেছে যে নারী ও পুরুষের প্রণয়ের ব্যাপারে শ্রী ওর চেয়ে অনেক বেশী গোঁড়া। সঞ্জয়ের জীবনে, ওদের বিয়ের আগে যে আর একজন ছিল সেটা শ্রী কি নির্দ্বিধায় মেনে নেবে? কি ভাবে রিঅ্যাক্ট করবে সে, সঞ্জয় যদি ওর জীবনে শর্মিলার অধ্যায়টা শ্রীর কাছে খুলে ধরে!

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে কুল কিনারা খুঁজে পেল না সে।

অফিসের বন্ধ দরজায় খট্‌খট্ আওয়াজ। এবং পরমুহূর্তেই শ্রী'র তরল কণ্ঠ ভেসে এলো, "হল্লো, এনি বডি ইন্ দ্য রুম"?

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল সঞ্জয়। তারপরই ডেস্কে ফিরে এসে ছড়িয়ে থাকা চিঠিপত্র গুছিয়ে একটা ফাইলের মধ্যে রাখতে রাখতে বলল, "কি ব্যাপার? তুমি হঠাৎ"?

– আরে সে প্রশ্ন তো আমারই করার কথা। তুমি অফিস বন্ধ করে এখনো বেরোও নি! আমি কখন থেকে বাস স্টপের কাছে অপেক্ষা করছি তোমার!

তাই তো! সঞ্জয় ভুলেই গিয়েছিল আধ ঘন্টা আগেই অফিস বন্ধ করে ওর বেরিয়ে যাবার কথা ছিল! বাস স্টপের কাছে শ্রীতমার জন্য দাঁড়াবার কথা ছিল। সেখান থেকেই তো ওরা রোজ হেঁটে বাড়ি ফেরে।

– "হল কি তোমার ? কি ভাবছ অত?" শ্রীতমার প্রশ্নে সম্বিৎ ফিরে পেল সে।

তাড়াতাড়ি অফিসের দরজা লক্ করে গৃহাভিমুখে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

ইউনিভর্সিটি ক্যাম্পস্ থেকে ওদের বাড়ি হাঁটা পথে দশ মিনিট। এই সময়টুকু সেদিন শ্রীতমাই এক তরফা বক্‌বক্ করে গেল। সঞ্জয় শুধু মাঝে মাঝে হ্যাঁ-হুঁ ছাড়া কিছু বলল না।

বাড়ি পৌঁছে প্রথমেই চা করল শ্রীতমা। সঞ্জয় চুপ করে সোফায় বসে রইল। এক কাপ চা আর আগ্রার ডালমুট ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে শ্রীতমা বলল, "তোমার কেস্‌টা কি বলো তো। খুব অন্যমনস্ক লাগছে"।

– "নাঃ, কিছু হয় নি তো"! ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল সঞ্জয়। তারপর চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে নিজের স্টাডির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে হবে, শ্রী, ইফ্ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। কাল একটা ক্লাসের জন্য কিছুটা তৈরি হতে হবে"।

নৈশ ভোজনের সময়েও চুপ্‌চাপ রইল সঞ্জয়। অনেক শখ করে সেদিন চিলি চিকেন আর ফ্রায়েড রাইস রেঁধেছিল শ্রীতমা। সচরাচর শ্রীতমা কিছু রান্না করলে ধন্য-ধন্য করে সঞ্জয়। কিন্তু সেদিন খেতে বসে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত রইল সে। তারপর খাওয়া শেষ করে আবার স্টাডিতে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ করল।

অভিমান হয়েছিল শ্রীতমার। কিন্তু নিজেকে বোঝাল যে নিশ্চয়ই কালকের ক্লাসের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেই সঞ্জয় এতখানি অন্যমনস্ক! সেও তার কাজকর্ম সেরে, শুয়ে পড়ল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ সঞ্জয়ের হাতের মৃদু স্পর্শে ঘুম ভেঙ্গে গেল শ্রীতমার। ঘুম চোখে সে তার পাশে বসা স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, "তুমি এখনো শুতে আসো নি"?

– "শ্রী, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে"।

– কাল সকালে বললে হয় না? এখন বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

– না, শ্রী, এখনি বলতে হবে। সকালে বলার মুড আর না-ও থাকতে পারে আমার।

বিস্মিত হয়ে, অগত্যা বিছানায় উঠে বসে শ্রীতমা বলল, "বল, কি বলবে"।

আনমনে একটা সিগারেট ধরাল সঞ্জয়। জোরে একটা টান দিয়ে বলল, "অস্ট্রেলিয়াতে আমার ছাত্রজীবনের অনেক গল্পই তোমাকে বলা হয় নি। এখন বলতে চাই সে সব গল্প"।

পাগল আর কাকে বলে! এত রাতে এখন অস্ট্রেলিয়ার গল্প! মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবল শ্রীতমা। কিন্তু মুখে বলল, "ঠিক আছে। বলো"।

– এখানে নয়। চলো বসার ঘরে যাই।

– চলো।

ওরা দুজনে বসার ঘরে গিয়ে সোফায় বসল। চট্ করে গিয়ে শ্রীতমার জন্য এক কাপ চা করে আনল সঞ্জয়। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করে নিয়ে সে তার গল্প আরম্ভ করল।

* * * * *

সতেরো বছর বয়সে, সম্পূর্ণ একা-একা, সঞ্জয় মুখার্জী নামে একটা গোবেচারা ছেলে মার্চ মাসের এক সকালে, এসে নেমেছিল মেলবোর্ন বিমান বন্দরে। ছেলেটা বাবা-মায়ের একমাত্র। ভারি আদুরে। তাকে এতদূর একা পাঠাতে মন চায় নি বাবা-মায়ের। অথচ পাঠাতে হয়েছিল, বাধ্য হয়েই। সঞ্জয়ের দাদামশাই দায়িত্ব নিয়েছিলেন, বিদেশে ওর পড়াশোনার সমস্ত খরচ বহন করার। সঞ্জয় ইঞ্জিনীয়ার হয়ে বেরোন পর্যন্ত।

সতেরো বছর বয়সে সেই প্রথম, সঞ্জয়ের মেলবোর্ন বিমান বন্দরে এসে নামার দিনটারও অনেক বয়স হয়েছে। অথচ আজও চোখ বুজলে সঞ্জয় স্পষ্ট দেখতে পায় দশ বছর আগের সেই দিনটা। ঠিক যেমন দেখতে পায় অতিক্রম করে আসা ছাত্রজীবনের আরও অনেক ঘটনাই।

মায়ের আঁচলের তলা থেকে বেরিয়ে সোজা সাত সমুদ্দুর পার করে সুদূর অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পাড়ি দিয়েছিল সঞ্জয় অবশেষে! প্লেনে ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সঞ্জয়ের মনে হচ্ছিল ও যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে আছে। কিন্তু প্লেনে উঠে এয়ার হোস্টেসদের মুখোমুখি হতেই সেই ঘোর কেটে গিয়েছিল। অতঃপর ওদেরই নির্দেশ অনুযায়ী হাতের ব্রীফ কেসটা ওভারহেড ক্লোজেটে তুলে দিয়ে নিজের সীটে বসে, কম্পিতহস্তে সীট বেল্টটা বেঁধে নিয়েছিল।

প্লেন আকাশগামী হতেই হাহাকার করে উঠেছিল সঞ্জয়ের মন। শেষমেস তাকে কোলকাতা ছাড়তে হল!

কয়েক ঘন্টার জন্য সিঙ্গাপুরে থেমেছিল প্লেনটা। বাধ্য হয়েই বেরোতে হয়েছিল সঞ্জয়কে। এয়ারপোর্টে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল কিছুক্ষণ। এক সময়ে একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টোরেন্টে ঢুকে পড়েছিল গরম কফির প্রত্যাশায়। ভেতরে ঢুকে কয়েকজন ভারতীয় চেহারা দেখে মনটা খানিক আশ্বস্ত হয়েছিল ওর। রেস্টোরেন্টে এক কোণে একটা টেবিলের পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল সে। বুকের ধুক্‌পুকুনি একটু কমলেও কত সহস্র সংশয়, দ্বিধা, চিন্তা মাথার মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি হয়ে ভন্‌ভন্ করছিল। এতগুলো নাতি-নাত্‌নির মধ্যে দাদামশাই কেন যে ওকেই বেছে বিদেশে পড়াতে পাঠাল! প্রথমটায় দাদামশায়ের এই সংকল্পের জন্য সঞ্জয়ের যতটা গর্ব হয়েছিল, আজ এই মুহূর্তে ততটাই রাগ হচ্ছে নিজের ওপরে। কেন যে দাদামশায়ের কথায় রাজী হতে গিয়েছিল! তবে দাদামশায়ের সংকল্পটা বাবা-মা কেন অত সহজে মেনে নিলেন, তাও বোঝে সঞ্জয়।

সঞ্জয়ের অর্ডারমত দোসা আর কফি এসে গিয়েছিল দশ মিনিটের মধ্যে। আনমনে কফিতে চুমুক দিয়েছিল সে।

পাড়ি দেবার দুদিন আগে মা ওকে আড়ালে ডেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "দ্যাখ্ বাবা, তোর দাদামশাই যে তোর পড়াশোনার ভার তুলে নিলেন সেটা যে কত বড় সৌভাগ্য, আজ তা বুঝবি না। পরে বুঝতে পারবি"। সঞ্জয়কে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মা আবার দুঃখ দুঃখ গলায় বলেছিলেন, "সবই ভাগ্য। আমাদের ত' সে অবস্থা নেই যে তোর আই আই টী-র পড়ার খরচ টানব। এই রকম সুযোগ হারাতে নেই।" সঞ্জয় বুঝেছিল মা ঠিকই বলছেন।

– "ডু ইউ মাইন্ড ইফ্ আই শেয়র ইওর টেবিল," চম্‌কে উঠে সঞ্জয় দেখেছিল একটা মেয়ে ওর সমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার খোলামেলা, অসঙ্কুচিত হাবভাব দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে মিন্‌মিন্ করে ও বলেছিল, "অফ্ কোর্স নট্।"

– "থ্যাংক্‌স্," বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর মুখোমুখি বসেছিল মেয়েটা। মনে মনে উশখুশ করছিল সঞ্জয়। কি বলবে ঠিক ভেবে পারছিল না।

– "আমি শর্মিলা। শর্মিলা বসু," মেয়েটি বলেছিল।

– "ও আচ্ছা," সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল সঞ্জয়।

– "তোমার নাম বললে না ত'?" একটু অপেক্ষা করে বলেছিল মেয়েটি। সঞ্জয় দেখেছিল মুখ টিপে হাসছে সে।

– আমার নাম সঞ্জয় মুখার্জী। আপনি বাঙ্গালি ?

– "অগত্যা! নইলে কি আর বাংলা বলি ?" হাসিমুখে সকৌতূকে বলেছিল শর্মিলা।

সঞ্জয় চুপ করে ওর দিকে চেয়ে ছিল। ভাবল, কি স্মার্ট মেয়ে রে বাবা! কতই বা বয়স হবে! অথচ কেমন নির্ভীক হাবভাব।

বেয়ারা এসে শর্মিলার জন্য আর এক দফা দোসা আর গরম কফি দিয়ে গেল।

– "আমাকে আপনি আজ্ঞে কোরো না ত'! তুমিই বলো, যেমন আমি তোমাকে বলছি।" অম্লানবদনে দোসা চিবোতে চিবোতে বলেছিল সেই মেয়ে।

নিরুত্তরে মাথা নেড়েছিল সঞ্জয়।

– "সঞ্জয়, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?" কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল শর্মিলা।

– মেলবোর্নে। পড়াশোনা করতে।

– "কি পড়াশোনা ? তুমি ত' খুবই ছোট।" বিস্ময় ফুটে উঠল শর্মিলার প্রশ্নে, "মনে হচ্ছে স্কুল কিড!"

মানে লেগেছিল সঞ্জয়ের। অথচ মনে মনে স্বীকার না করে উপায়ও ছিল না তখন, যে মাত্র কয়েকমাস আগে সে স্কুলেই পড়ত। বলেছিল, "মেলবোর্ন ইউনিভর্সিটিতে ইঞ্জিনিয়রিং পড়ব আমি এ বছর।"

– "বাব্বাঃ! তাই?" চোখ বড় বড় করেছিল শর্মিলা।

– হ্যাঁ। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

– "আমি যাচ্ছি ব্রিসবেনে। সেখানে কুইন্‌স্‌ল্যান্ড ইউনিভর্সিটিতে পড়ি। ফাইনাল ইয়ার এ বছর। সামনের বছর আমি পোস্টগ্র্যাড্ মেডিসিন আরম্ভ করব।" সগর্বে বলেছিল শর্মিলা।

– তুমি ভারতে কোথায় থাকো ?

– "ভারতে ?" শর্মিলা হেসেছিল একটু। বলেছিল, "সারা জীবন দিল্লীতে কাটিয়েছি। ওখানেই আমাদের বাড়ি ? তুমি ?"

– কোলকাতা।

– "তা তুমি এত ভয়ে ভয়ে আছো কেন ? এই প্রথম বাড়ির বাইরে বেরিয়েছ বুঝি ?" আর একটা দোসার টুক্‌রো মুখে পুরে পা নাচাতে নাচাতে বলেছিল শর্মিলা। আড়চোখে একবার ওকে দেখে নিয়েছিল সঞ্জয়। ঝক্‌ঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা মেয়েটার। রোগা, লম্বা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। বিশাল নয়না। অজন্তা-ইলোরার মূর্তির মত খোদাই করা মুখ-চোখ।

– "এই প্রথম বাড়ি ছাড়া ?" আবার প্রশ্ন শর্মিলার।

– হ্যাঁ।

– ভয় পেও না। ওখানে দেখবে সবাই খুব ফ্রেন্ডলি। কোথায় থাকবে তুমি ?

– এখনো জানি না। সরকারী এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের একজন এডুকেশন অফিসার, মিঃ অস্টিন, এয়ারপোর্টে আসবেন আমাকে নিতে। তিনিই সব ব্যবস্থা করছেন।

– "তাহলে ত' খুবই ভাল। মিঃ অস্টিন উইল টেক গুড কেয়ার অফ্ ইউ। ভয়ের কিচ্ছু নেই", দুই হাত তুলে অভয় দিয়ে বলেছিল শর্মিলা। ওর আন্তরিক ভঙ্গীটা সঞ্জয়কে হঠাৎই মায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। এত ছেলেমানুষ একটা মেয়ের এমন নির্ভীক স্বাধীনচেতনা দেখে মনে মনে চমৎকৃত হয়েছিল সে।

– "সিড্‌নী থেকেই ত' প্লেন বদল করবে তুমি ?" শর্মিলা আবার প্রশ্ন করেছিল।

– হ্যাঁ। আর তুমি ?

– "আমিও। তাহলে সিড্‌নী থেকে আমিই তোমাকে প্লেনে তুলে দিতে পারব"। আবার অভয়বাণী শোনাল শর্মিলা।

আঃ! নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল সঞ্জয়। প্লেনে যদিও ওদের আলাদা আলাদা সীট ছিল, সিড্‌নী এয়ারপোর্টে নেমেই শর্মিলা ছুটে এসে সঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যারুসেল থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে সঞ্জয়ের বোর্ডিং গেটের কাছে এসে পড়ছিল ওরা।

শর্মিলা বলেছিল, "আমাকেও এবার ছুটতে হবে প্লেন ধরতে। আসি সঞ্জয়। চিন্তা কোরো না। এখানকার লোকেরা খুব হেল্পফুল। ইউ উইল বী ফাইন, ম্যান। বেস্ট অফ্ লক্"। শর্মিলার চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখে জল এসে গিয়েছিল সঞ্জয়ের। ভেবেছিল, শর্মিলাও যদি ওর সঙ্গে মেলবোর্ন আসত!

সিড্‌নী থেকে মেলবোর্ন প্লেনে ঘন্টাখানেকের পথ। পৌঁছতে দেরী হল না। প্লেন থেকে নেমে লগেজ গুছিয়ে নিয়ে ক্যারুসেল পেরিয়ে বাইরে বেরোতে বেগ পেতে হয় নি সঞ্জয়কে। চারিপাশে এত শ্বেতাঙ্গ মানুষ, তাদের আজব অ্যাক্সেন্ট আর অনবরত ইংরেজী বোলচালের সম্মুখীন হয়ে খানিক ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়। এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে এসে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারিদিক দেখেছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাতে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন ওর দিকে। প্ল্যাকার্ডে বড় বড় হরফে লেখা Sanjoy Mukherjee।

সঞ্জয় এগিয়ে আসতেই হাত বাড়িয়ে ওর করমর্দন করে ভদ্রলোক বলে ছিলেন, "গুড আফ্‌টারনুন। আই অ্যাম মার্ক অস্টিন। সো নাইস্ টু মীট ইউ, সান্‌জয়"।

– "হ্যালো", বলে চুপ করে তাকিয়ে ছিল সঞ্জয়। মনে মনে ভাবছিল, এত লোকের মধ্যে উনি কি করে বুঝে ফেললেন যে আমিই সঞ্জয়। অবশ্য পরক্ষণেই নিজের নির্বুদ্ধিতায় হেসে ফেলেছিল। এখানে তার মত নন-হোয়াইট, উদ্ভ্রান্ত চেহারার ছেলে যে ধারেকাছে আর কেউ নেই!

– "হাউ ওয়াস্ দ্য ফ্লাইট?" সঞ্জয়ের বড়, ভারি সুটকেশটা অনায়াসে একহাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মার্ক অস্টিন। মার্কের উচ্চারণের জন্য বক্তব্যটা পুরোপুরি বোধগম্য হয় না সঞ্জয়ের। নিঃশব্দে মাথা নেড়েছিল সে।

পরপর তিনটে প্রশ্ন করেও মার্ক অস্টিন যখন সঞ্জয়ের কাছ থেকে মাথা নাড়া ছাড়া আর কোন উত্তর পেলেন না তখন একটু থম্‌কে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "অ্যাম আই মেকিং এনি সেন্স টু ইউ?"

একটু ভেবে সঞ্জয় শংকিত গলায় বলেছিল, "নাহ্।"

"ইট্ ইস্ অল্ বিকজ অফ্ মাই স্টুপিড্ অ্যাক্সেন্ট," ফিক্ করে হেসে ফেলেছিলেন মার্ক অস্টিন, "ডোন্ট ওয়রি, মেট। আই উইল টেক ইউ টু মিসেস সীবর্ন। ইউ সী, উই উইল টীচ ইউ ইংলিশ – প্রপর স্ট্রায়ন ইংলিশ। ইউ উইল বী রাইট, মেট।"

* * * * *

মেলবোর্নের মাটিতে পা রাখার এক সপ্তাহ পর। এক শনিবার সকালে মিসেস আইলীন সীবর্নের বাড়ির দরজায় এসে কলিং বেল টিপলেন মার্ক অস্টিন।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো এক শ্বেতাঙ্গ কিশোর আর তার পেছন পেছন সঞ্জয়ের সমবয়সী, ওরই মত আর একটি বিদেশী ছেলে। ছেলেটির গায়ের রং দুধে আলতায়, মুখ-চোখ কাটাকাটা আর মাথাভর্তি বাদামী চুল।

শ্বেতাঙ্গ ছেলেটি এগিয়ে এসে, একগাল হেসে বলল, "গুড মর্নিং মিস্টর অস্টিন। প্লীজ কম্ অন্ ইন্"।

– "গুড মর্নিং ইয়েন, গুড মর্নিং বিন্-আয়"। ছেলে দুটোকে অভিবাদন করে সঞ্জয়কে দেখিয়ে উনি বললেন, "লুক হু ইস্ হিয়ার টু জয়েন ইউ দিস্ মর্নিং"।

শ্বেতাঙ্গ ছেলেটি আর একটু এগিয়ে এল। পেছন পেছন অন্য ছেলেটিও। সঞ্জয়কে দেখিয়ে মার্ক অস্টিন আবার বললেন, "দিস্ ইস্ স্যান-জয় মূকর্জি, বয়েস"। তারপর সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "স্যান্-জয়, হিয়র আর ইয়েন সীবর্ন অ্যান্ড বিন্-আয় রানা। বিন্-আয় ইস্ ফ্রম নেফল, অ্যান্ড লিভ্স্ হিয়র উইথ দ্য সীবর্নস্"। নেফল মানে কি নেপাল! সঞ্জয় মনে মনে ভাবল।

ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসার ঘরে বসল। বিন্-আয় রানাও সোফার এক পাশে বসল, সসংকোচে। লাজুক হাসিতে উজ্জ্বল মুখ।

ইতিমধ্যে ইয়েনের চেঁচামেচিতে – "মম্, লুক্ হু আর হিয়র" – হাঁকডাক শুনে এপ্রনে হাত মুছতে মুছতে যে মাঝবয়সী শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাটি ঘরে এসে ঢুকলেন, তাঁকে এক নজর দেখেই সঞ্জয়ের মন শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় ভরে গেল। ওঁকে দেখেই মার্ক অস্টিন উঠে দাঁড়িয়ে, সসম্ভ্রমে মাথার হ্যাট খুলে নতশিরে সংবর্ধনা জানালেন, "গুড মর্নিং মিসেস সীবর্ন। হাউ আর ইউ টূ ডায়"?

মিসেস আইলীন সীবর্ন। স্নেহময় মাতৃত্বের এমন সৌন্দর্য যে এক বিদেশিনীর মধ্যেও দেখতে পাওয়া যাবে এর আগে কখনো মনে হয় নি সঞ্জয়ের।

– আই অ্যাম ভেরি ওয়েল, থ্যাংক্যু, মার্ক," আইলীন সীবর্ন বললেন, "ইস্ দিস্ ইয়ং ম্যান স্যান-জয় ?

– "ইয়েস, ম্যাম্। হী শিওর ইস্ স্যান-জয় মূকর্জি। দ্য চ্যাপি আই টোল্ড্ ইউ অ্যাবাউট অন্ দ্য ফোন"। মার্ক অস্টিন হেসে বললেন।

– "আই সী", বলে সঞ্জয়ের দিকে ঝক্‌ঝকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন আইলীন সীবর্ন, "প্লীজ টেক আ সীট"।

সেই দিন মিসেস আইলীন সীবর্নের বাড়িতে বোর্ডার হয়ে ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়েছিল সঞ্জয়ের।

"বিন-আয়" না, আসলে "বিনয়"। নেপালের বিখ্যাত রানা পরিবারের ছেলে। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমনি অমায়িক। রানা পরিবারের ছেলে বলে কোন রকম বাড়তি দম্ভ নেই তার। বিনয়ের স্কুলেই সঞ্জয়কে ভর্তি করে দিলেন মার্ক অস্টিন। ট্রিনিটি বয়েস্ গ্রামার স্কুল। একসঙ্গে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে এক সময়ে ভাল বন্ধু হয়ে উঠল ওরা। আইলীন সীবর্নের বাড়িতেও একটা ঘর শেয়র করে থাকার ব্যবস্থা ওদের।

প্রথম দিন থেকেই বিনয়ের দেখাদেখি সীবর্ন দম্পতিকে মম্ আর ড্যাড বলতে আরম্ভ করেছিল সঞ্জয়। ওর ছয় মাস আগে মেলবর্ন এসেছিল বিনয় এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত এডুকেশন অফিসার মার্ক অস্টিনেরই মধ্যস্থতাতে সীবর্ন পরিবারভুক্ত হয়েছিল।

* * * * *

একমাত্র সন্তান ইয়েনকে নিয়ে আইলীন এবং ফ্রেড সীবর্নের বাড়ির হাওয়া বিলিতি কায়দা-কানুনে আপ্লুত। পরিবেশের প্রভাবে ইয়েনও বেশ কেতাদুরস্ত। যদিও সে স্থানীয় সরকারী স্কুলেই পড়ে, বিনয় আর সঞ্জয়ের মত নামী-দামী গ্রামার স্কুলে না। লোকে ওঁর পোষ্য ছেলেদুটিকে যাতে অভদ্র ইল্-ম্যানার্ড না বলে বসে, সেই ভয়ে আইলীন সীবর্ন, বিনয় আর সঞ্জয়কেও বিলিতি এটিকেটের অন্ততঃ অ-আ-টুকু শেখাতে আগ্রহী হলেন।

স্কুলের ইউনিফর্ম পরে ওরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে হয়ত' বলল, "ক্যান আই হ্যাভ আ টোস্ট?" আইলীন সীবর্ন মুচ্‌কি হেসে উত্তর দেন, "মে আই স্প্রেড সম্ বটর ওন ইট ?" ইয়েনও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, "ইউ শুড্ অলওয়েজ সে – মে আই – অ্যান্ড নেভর ক্যান আই !"

সন্ধ্যাবেলা ডিনার টেবিল ঘিরে ওরা জমায়েত হয়। সকলে হাত জোড় করলে, ফ্রেড সীবর্ন প্রথমেই "গ্রেস" বলবেন – For what we are about to receive, may the lord make us truly thankful. And may we always be mindful of the needs of others, for Jesus sake, Amen.

প্রথম পর্বে আইলীন সীবর্ন পরিবেশন করেন স্যুপ। দ্বিতীয় পর্বে আসবে রোস্ট ল্যাম্ব বা রোস্ট চিকেন বা গ্রিল্ড্ ফিশ অথবা ফিশ অ্যান্ড চিপ্‌স্। সঙ্গে "ফোর ভেজিস", অর্থাৎ ভাপানো আলু, ফুলকপি, গাজর ও মটরশুটি। এবং সবশেষে ডেসার্ট। প্রথম প্রথম কাঁটা আর ছুরি নিয়ে অনভ্যস্ত হাতে সঞ্জয় মটরশুটিগুলোকে তাড়া করে বেড়াত আর যেন নিছক মজা করার লোভেই মটরশুটিরা প্লেটের ওপর চতুর্দিকে ছুটে বেড়াত। ভারি অপ্রস্তুত বোধ করত সঞ্জয়। আইলীন সীবর্ন একদিন ওর পাশে বসে বললেন, "আমাকে লক্ষ করো। আমি কি ভাবে মটরশুটিগুলোকে ম্যানেজ করি।" ওঁর দেখাদেখি সঞ্জয় কাঁটার মুখে বেশ কিছু মটরশুটি একসঙ্গে বিঁধিয়ে নিয়ে মুখে পোরার কায়দাটা শিখে ফেলল।

"কোন মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটার সময়ে, পুরুষ হিসেবে তুমি সব সময়ে রাস্তার দিকে থাকবে। মেয়েটি থাকবে তোমার বাঁদিকে"। মম্ বলে দিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে কোন মেয়ের সঙ্গে হাঁটার সৌভাগ্য না হলেও, উপদেশটা সঞ্জয়ের স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল, ঠিক যেমন গেঁথে গিয়েছিল আর একটি ঘটনা।

একদিন ইয়েন ওদের দুজনকে নিয়ে গিয়েছিল ওর মাস্‌তুতো ভাইয়ের বাড়ির বার-বি-ক্যুতে। সেখানে সেঁকা মাংস আর নানা রকমের স্যালাড খেতে খেতে, ইয়েনের সঙ্গে ওরাও কয়েক গেলাস কোল্ড বিয়ার খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল। ছেলেদের হাবভাবে ব্যতিক্রম লক্ষ করে সন্দেহ হয়েছিল আইলীন সীবর্নের। ওঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সঞ্জয় আর বিনয় ঘরে ঢুকে, দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

আইলীন সীবর্ন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে নিজের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট্‌স্ দ্য ম্যাটার ? হোয়াই আর দ্য বয়েস অ্যাক্‌টিং স্ট্রেঞ্জ ?"

ইয়েন ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বলল, "ওয়েল, দে ট্রায়েড সম্ বিয়ার টু ডে ফর দ্য ফর্স্ট টাইম। দ্যাট্‌স্ অল্।"

– "হোয়াট!" আইলীন সীবর্ন ভয়ানক রেগে গিয়ে বললেন, "হোয়াই ডিড্ ইউ লেট্ দেম ?"

– "মম্, দে আর নট্ চিল্ড্রেন, ইউ নো," তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল ইয়েন, "দে ক্যান ড্রু হোয়াটেভর দে ওয়ান্ট।"

– নো দে কান্ট্ !" আইলীন সীবর্ন মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, "সর্টেন্‌লি নট্ হোয়াইল দে আর ইন্ মাই কস্টডি। দে আর মাই রেস্‌পন্‌সিবিলিটি।"

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা রাখার আগে কোলকাতায় সঞ্জয় একবার শুনেছিল, কোন্ এক বিখ্যাত বাঙ্গালি লেখক নাকি বলেছেন যে বাংলায় ঘরে ঘরে মায়েরা বাস করেন, যাঁদের ভালবাসার সীমা নিজের গর্ভজাত সন্তানদের অতিক্রম করে, সম্প্রসারিত হয় অপরের সন্তানের প্রতি। আইলীন সীবর্ন বাংলার মেয়ে না হয়েও, সঞ্জয় আর বিনয় তাঁদের ছত্রছায়ায় আসা অবধি "মা" সম্বন্ধে সেই বাঙ্গালি লেখকের ধারণাকে সত্যি প্রমাণিত করেছিলেন।

সে রাতে ডিনার টেবিলে বসে ফ্রেড সীবর্নের গ্রেস বলার পরেই আইলীন সীবর্ন বিদেশী ছেলেদুটিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমরা কি নিজের দেশে থাকতেও অ্যাল্‌কহলিক ড্রিংক পান করতে ?"

– "না ত!" ঘাবড়ে গিয়ে সঞ্জয় উত্তর দিয়েছিল।

– "দেন? হোয়াই ড্রু ইউ ওয়ান্ট টু ড্রিংক অ্যাল্‌কহল হিয়র ?"

– "বিকজ উই আর ইন্ আ কন্ট্রি হোয়ের অ্যাল্‌কহল ইজ্ মচ্ অ্যাক্‌সেপ্টেড্ অ্যাজ আ পার্ট অফ্ লাইফ", বিনয় বলেছিল।

– "ইয়েস্, অফ্ কোর্স," আইলীন সীবর্ন বলেছিলেন, "বট্ ডোন্ট্ ফরগেট্ ইউ আর ফ্রম আ ডিফারেন্ট সোসাইটি উইথ ডিফারেন্ট ভ্যালুজ। ড্রু নট্ অ্যাবান্ডন ইওর ওন্ ফ্যামিলি ভ্যালুজ্। বিদেশী রেওয়াজ অনুসরণ করতে গিয়ে নিজেদের পারিবারিক মূল্যবোধগুলোকে জলাঞ্জলি দিও না। দোহাই তোমাদের"।

ডিনার টেবিলের আবহাওয়া থম্‌থমে রইল সারাটা ক্ষণ।

পরে, খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে সঞ্জয় ছাড়া সবাই যখন টেবিল ছেড়ে চলে গেল, ফ্রেড সীবর্ন এসে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "লেট্‌স্ গো আইটসাইড, মাই বয়"।

ওঁদের সেই মনোরম ব্যাকইয়ার্ডে, বড় বড় ফল গাছ, ছোট হর্ব গার্ডেন আর বিশাল ক্যামেলিয়া গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্চ পাতা। গোলাপি-সাদা ফুলের ঝাঁকে নুয়ে পড়া একটা ক্যামিলিয়া গাছের নীচে পাতা বেঞ্চটাতে বসে চুরুট ধরিয়েছিলেন ফ্রেড সীবর্ন। সঞ্জয় ওর পাশে বসেছিল শুষ্কমুখে।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। ঠান্ডা হাওয়ার পরশে শরীর মন জুড়িয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়ের। ঘড়িতে ন'টা বাজতে দেরী নেই আর বেশী, কিন্তু সূর্য তখনো অস্ত যেতে অনিচ্ছুক। ঝুলে আছে আকাশের দক্ষিণ দিশায়। ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁদের কলতান।

উনিশ বছরের সঞ্জয়ের কাছে তখন সময়ের গতি যেন আলোর রশ্মি, হাওয়ার চেয়েও দ্রুত। প্রতীক্ষার ধৈর্য নেই সময়ের। বর্তমানের মুহূর্তগুলোকে চক্ষের নিমেষে অতীতের কোলে ঠেলে দিয়ে, ভবিষ্যতকে বর্তমানের প্রাঙ্গণে টেনে নিয়ে আসতে একটুও দ্বিধা নেই তার। আর সময়ের নির্মম দ্রুতচারিতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে, নিমেষে অতীত হয়ে যাওয়া জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সুখ, দুঃখ, সাফল্য, হতাশা – লক্ষ লক্ষ মুক্ত কণিকার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখতে থাকল সঞ্জয়ের স্মৃতির কোঠা।

তার মেলবোর্নের ছাত্রজীবন তখন দু-দুটো বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরের মাঝামাঝি। সঞ্জয় এদেশে পা রাখার পর প্রথম বছরটা কেটেছিল স্কুলের শেষ পরীক্ষার প্রস্তুতিতে। সেই পরীক্ষার অসাধারণ সাফল্যই তাকে ইঞ্জিনিয়রিং ফ্যাকল্টিতে প্রবেশ অধিকার দিয়েছিল। ফ্রেড আর আইলীন সীবর্নের স্নেহভরা আশ্রয় ছেড়ে সঞ্জয় অতঃপর উঠে গিয়েছিল মেলবোর্ন ইউনির্ভসিটির বিখ্যাত ছাত্রাবাস অরমন্ড কলেজে। দাদামশায়ের আর্থিক সাহায্য ছাড়াও সে তখন নিজে, প্রতিটি ছুটির সময়ে কাজ ক'রে উপার্জন করে। উপার্জন করার প্রথম সুযোগ এসেছিল স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার পরই।

ওদের স্কুলের গুটিকয়েক ছেলের কাছে শুনল, দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিতে ওরা লিলিডেলের একটা অর্চার্ডে চেরি পিকিং-এর কাজ নিয়ে যাবে। এমন একটা ব্যাপার কোনদিন শোনে নি সঞ্জয়। ওই দলের টম নীল নামে একটি ছেলের সঙ্গে খানিক আন্তরিকতা হয়েছিল সঞ্জয়ের। তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিল যে ওরা দল বেঁধে এক ফার্মারের অর্চার্ড কাজ করতে যাচ্ছে।

"ইউ ক্যান জয়েন অস্ টু, ইফ ইউ উইশ", টম বলেছিল। বিনয় আর সঞ্জয় সেদিনই একটা টু ম্যান্ টেন্ট্ কিনে নিয়েছিল। মিসেস আইলীন সীবর্নের অনুমতি নিয়ে, একটা ছোট বাক্সে ওঁরই প্যাক করা কিছু টীনের খাবার, কর্ন ফ্লেক্স্, গুঁড়ো দুধ, চিনি ইত্যাদি নিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে ওরা রওনা হয়েছিল লিলিডেলের চেরি অর্চর্ড উদ্দেশ্যে।

মেলবোর্ন থেকে একচল্লিশ কিলোমিটারের ব্যবধানে লিলিডেলে ক্ষুদ্র একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডে যে যার তাঁবু খাটিয়ে নিয়েছিল ছেলেরা। সঞ্জয় আর বিনয় একই তাঁবুর মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। খুব কাছেই একটা টয়লেট ব্লক এবং হট শাওয়ারের ব্যবস্থা।

ড্যান্ডিনং পাহাড়ের কোলে লিলিডেলের সেই ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড আর তার নিকটবর্তী চেরি ফার্মের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অপরূপ, অবর্ণনীয়। লাল, সবুজ আর কমলা রংয়ে পাখ্না ডুবিয়ে-আসা রোসেলা টিয়াদের কলরব। গ্রীষ্মের তাপ নেভানো ঠান্ডা হাওয়ার পরশ। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়।

ফার্মে, টুক্টুকে লাল আর লাল-সাদা ফলের থোকায় ঝুঁকে পড়া অসংখ্য চেরি গাছ।

ফার্মের মালিক ওদের প্রত্যেকের কোমরে বেঁধে নেবার জন্য একটা করে মাঝারি সাইজের ঝুড়ি দিল, আর সঙ্গে একটা করে তেপায়া মই। তারপর কাজ বুঝিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

প্রতিটি গাছের তলায় একটা করে বড় কাঠের বাক্স। সঞ্জয় মইয়ের শেষ ধাপটার ওপর পা ফেলে গাছের নাগাল পেল। শিখে ফেলল চেরি তুলতে হয় বোঁটা সমেত এবং তিন-চারটি চেরির বোঁটা সংলগ্ন থাকে এক এক থোকায়। এইভাবেই গাছ থেকে তুলে সন্তর্পণে রাখতে হয় কোমরে বাঁধা ঝুড়িতে। তারপর ঝুড়ি ভরে গেলে মই বেয়ে নেমে এসে ঝুড়ি খালি করে সব চেরি ঢেলে দিতে হয় কাঠের বাক্সটার মধ্যে। সারাটা দিন এভাবে কেটে গেল ওদের। সন্ধ্যেবেলা মালিক এসে প্রত্যেকটি বাক্স গুনে নিয়ে ওদের হাতে তুলে দিল করকরে নোট। সঞ্জয়ের আনন্দ যেন বাঁধ মানে না। জীবনে এই প্রথম রোজগার

তার। অন্ধকার নেমে আসতে, ছেলেরা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডের পাব্লিক স্নানাগারে স্নান করে, জামাকাপড় পাল্টে নিল। তারপর ক্যাম্প ফায়ার জ্বেলে সকলের আনা নানা রকম খাবারের ক্যানগুলো গরম করে নিয়ে নৈশাহারের পাট চোকাল।

প্রথম কটা দিন খুব উৎসাহে কেটেছিল সঞ্জয়ের। তারপরই একঘেয়েমির অবসাদে ভরে গেল ওর মন। শরীরে নেমে এলো দারুণ ক্লান্তি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা, চেরি তোলা পর্ব শেষ হতে মালিক যখন ওদের মাইনে-পত্তর মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল, সঞ্জয় গুটিগুটি গিয়ে বসল বিনয়ের কাছ ঘেঁসে। বিনয়ের চেহারাও তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত নয়। পকেট থেকে টিস্যু পেপার বার করে কপাল আর ঘাড় মুছতে মুছতে সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে বলল, "হোয়াট্স্ অপ্"?

আর হোয়াট্স্ অপ্! মুখ কাঁচুমাচু করে সঞ্জয় বলেছিল, "কান্ট স্ট্যান্ড দিস্ এনি মোর। আই অ্যাম গোয়িং ব্যাক হোম"।

– "মী টূ", একবাক্যে সায় দিয়ে বলেছিল বিনয়, "এনঅফ্ দিস্ চেরি পিকিং"।

পরদিনই ওরা দুজন সকাল-সকাল ট্রেন ধরে ফিরে এসেছিল বাড়ি।

– "বট্ ইট্ ওয়াস্ আ গুড্ এক্সপিরিয়েন্স্", বাড়ি ফিরে এসে আইলীন সীবর্নকে বলেছিল ছেলেরা। সেই রাতেই মাকে চিঠিতে লিখেছিল সঞ্জয় –

"চেরি পিকিং কাজের ভয়ংকর অভিজ্ঞতায় বুঝলাম পড়াশোনাটা আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে। সারাটা জীবন যদি ফ্রুট পিকিং করে কাটিয়ে দিতে হয় তবে . . . উফ্, ভাবলেই শিউরে উঠছি"। . . .

অস্ট্রেলিয়ায় এসে অবধি, মাকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চিঠি লেখে সঞ্জয়। ওর মনে হয়, জীবনে অতীত হয়ে যাওয়া সুখ-দুঃখ-ঝড়ঝাপ্টা এবং সংঘর্ষের বহু মূল্যবান মুহূর্তগুলোকে আট্কে রাখা যায় চিঠির মধ্যে।

তারপর এক সময়ে, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে শুধুই যখন অখন্ড অবসর আর শেষ পরিণতির অপেক্ষা – তখন সেইসব চিঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতেই অতীতে ফেলে আসা দিনগুলোর আভাস নতুন করে পাওয়া যায় – যখন কতশত স্বপ্নে বুক বেঁধে, পথের সমস্ত বাধাবিপত্তি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রগামী হয়েছিল একটা জীবন।

স্কুল পরীক্ষায় অসাধারণ রেজাল্ট করেছিল সঞ্জয়। তখন আইলীন সীবর্ন হাসিমুখে বলেছিলেন, "তুমি হয়ত' ইউনিভর্সিটির ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পেয়ে যাবে। পেলে কিন্তু সে সুযোগ হারিও না, মাই বয়। ছাত্রাবাসে আরো অনেক ছাত্রদের সঙ্গে, একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকতে পারলে ব্যক্তিত্ব নির্মাণে সাহায্য হয়। উই গ্রো অপ্ টু বিকম আ ফাইন জেন্ট্লম্যান"।

আইলীন সীবর্নের অনুমানই ঠিক হয়েছিল। বিনা খরচে মেলবর্ন ইউনিভর্সিটিতে অর্মন্ড হাউসে থেকে ইঞ্জিনিয়রিং পড়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিল সঞ্জয়। ইঞ্জিনিয়রিং-এ সুযোগ পেয়েছিল বিনয়ও। সে অবশ্য সীবর্ন দম্পতির সংসারেই থেকে গিয়েছিল।

* * * * *

– "গুড মর্নিং, স্যান-জয়", সাত সকালেই মার্ক অস্টিনের ফোন।

আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে ফোন ধরল সঞ্জয়, "গুড্ মর্নিং, মার্ক"।

– আর উই গোয়িং টু ব্যালারেট টু ডে, অ্যাস্ প্ল্যান্ড্"?

– অফ্ কোর্স। আই উইল বী রেডি ভেরি সূন।

– "ও কে আই অ্যাম কমিং টু ইওর প্লেস আফ্টর পিকিং অপ্ বিন-আয় অন্ দ্য ওয়ে"।

– "ফাইন", ফোনটা রেখে দিয়ে হুড়মুড় করে বাথরুমে ঢুকে পড়ল সঞ্জয়।

এদেশের পরম্পরা মাফিক, সকলকে নাম ধরে ডাকার অভ্যাসটি আয়ত্ত করে ফেলেছে সঞ্জয়, ইউনিভর্সিটিতে ঢোকার প্রথম বছরেই। গোঁড়ার দিকে ভারি সঙ্কোচ হত, ইতস্ততঃ করতে হত সঞ্জয়কে, কিন্তু এখন বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছে অভ্যেসটা।

এখানকার জাতিবর্ণহীন, ক্লাস-লেস সামাজিক ব্যবস্থাটা ওর খুব পছন্দ। তাছাড়া বয়সে কে কার বড়, কে কার ছোট – এসব না ভেবে যদি এই সত্যটা স্বীকার করে নেওয়া যায় যে একই যুগে, একই সময়ে, একই চন্দ্রসূর্যের তলায় এই বিরাট পৃথিবীতে আমরা সকলেই এক সঙ্গে হেঁটে চলেছি জীবনের পথে, তাহলে আমরা যে সমকালীন এটা মেনে নিতে আপত্তি কোথায়! সহজ, সরল ইকোয়েশন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই মার্কের লাল টুক্‌টুকে ভক্‌স্‌ওয়াগন্ এসে সঞ্জয়কে তুলে নিয়ে ব্যালারেটের দিকে রওনা দিল।

এদেশে ইওরীপয়ন সেটেল্‌মন্টের বয়স প্রায় আড়াইশো বছর ছুঁই ছুই। অর্থাৎ প্রাচীনতার দিক দিয়ে বিশ্বের বহু দেশের ইতিহাসের কাছে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস অতি নবীন। ভারত থেকে এসে, এদেশের অনেক ঐতিহাসিক স্থানের "প্রাচীনত্ব" দেখে সঞ্জয় কৌতূক বোধ করে।

মার্কের মুখে শোনা গেল ব্যালারেটও নাকি অম্‌নি এক মহত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক শহর যার গোঁড়াপত্তন হয়েছিল ১৮৩৮ সালে।

– "আমরা যাচ্ছি জর্জ হিলের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাদের লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছেন।" গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মার্ক। সামনে, মার্কের পাশে বসেছিল বিনয় আর পিছনে সঞ্জয়।

– "হু ইস্ জর্জ হিল? টেল অস্ অ্যাবাউট হিম।" বিনয় বলল।

– "হী ইস্ আ রিমার্কেব্‌ল জেন্টলম্যান। হী হ্যাস্ অল্ মাইট রেস্পেক্ট। বিট্ ওল্ডর দ্যান অল্ অফ্ অস্, ইউ নো – অ্যাবাউট সিক্‌স্‌টি অর সো", ফিক্ করে হাসল মার্ক, "দ্য ওল্ড বগর ইস্ আ বিট্ শাই অ্যাবাউট্ গিভিং আউট হিজ এজ!"

সবে ঊনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পা দেওয়া সঞ্জয়ের মনে হয়েছিল ষাট বছর বয়সের জর্জ অতি প্রাচীন এক মানুষ। ওর বাবার চেয়েও বড়।

ওঃ! ও মনে মনে বলেছিল, এত বুড়ো লোকের সঙ্গে সারাটা দিন কাটাতে হবে!

তাই হয়েছিল। কিন্তু ষাট বছরের সেই "প্রাচীন" মানুষটির বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, জীবনীশক্তি এবং টগ্‌বগে উৎসাহ দেখে সঞ্জয় আর বিনয় দুজনেই মুগ্ধ হয়েছিল। এবং সেদিন জর্জ হিলের সঙ্গে সারা দিন ঘুরে বেড়িয়ে, ওর বাড়িতে ডিনার খেয়ে ফিরেছিল একটু বেশী রাতেই।

সারাদিন অত ঘোরাঘুরি করেও রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসতে চায় নি সঞ্জয়ের। ওর কলকাতাবাসী বাবা আর ব্যালারেটবাসী জর্জকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দুজনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফারাকের কথা ভেবেছিল সে অনেকক্ষণ ধরে।

একটু একটু করে জর্জ হিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল সঞ্জয় আর বিনয়ের।

মাঝে মাঝে উইকেন্ডে জর্জ এসে হাজির হয় সঞ্জয়ের ঘরে যে কোন একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। ইউনিভর্সিটির লম্বা সেমেস্টর ব্রেকের সময় জর্জ অন্ততঃ দু-তিন সপ্তাহব্যাপী ছুটিতে বেরিয়ে পড়ে ওদের নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে। জর্জ খুব ধনী

ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। ব্যালারেট শহরের নামী-দামী, সম্ভ্রান্ত ওয়েবস্ট্রীটের বাসিন্দা। জর্জের তাক লাগানো প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রথমবার গিয়ে সঞ্জয় তো মুগ্ধ হয়েইছিল, এমন কি রাণা পরিবারের ছেলে বিনয়েরও কম চমক লাগে নি। চমৎকার ভিক্টোরিয়ন যুগের বাড়ি। মহারানী ভিক্টোরিয়ার যুগের আসবাব-পত্র দিয়েই সাজানো এবং নিখুঁত ভাবে মেন্টেন করা। বাড়িতে জর্জের সাথে থাকেন ওর মা সিল্‌ভিয়া হিল। তাদের দেখভালের জন্য আছে একজন ফুলটাইম হাউসকীপর, মলি। স্টেলা বলে এক ক্লীনিং লেডি আসে বাড়ি পরিষ্কার করতে সপ্তাহে একদিন। আর বাড়ির চারিপাশ ঘিরে ব্যাপক ইংলিশ গার্ডেনের তত্ত্বাবধান করে অ্যালেন কানিংহ্যাম। ফুলটাইম মালী। জর্জ অবিবাহিত এবং ওয়ার ভেটেরন।

কোন সময় জর্জের এক দাদা ছিল, যার নাম ছিল টোনি। ১৯৬৫ সালে, টোনির বয়স যখন একুশ আর জর্জের উনিশ – ওরা দুজনেই কন্‌স্ক্রিপ্ট হয়ে ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে যোগদান করেছিল। যুদ্ধ শেষে জর্জ বাড়ি ফিরে এসেছিল মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। টোনির আর ফেরাই হয় নি।

এসব গপ্প একদিন মিসেস হিলের কাছে শুনেছিল সঞ্জয় আর বিনয়। মলিকে ছুটি দিয়ে তিনি নিজেই সেদিন যখন নানারকম মফিন আর ফেরি কেক টেবিলে সাজিয়ে রাখছিলেন বিকেলে চায়ের জন্য। কিশমিশ-ভরা টোস্টের ওপর ছুরি দিয়ে মাখন লাগাতে লাগাতে বলেছিলেন, "টোনি লস্ট হিজ লাইফ। অ্যান্ড জর্জ লস্ট হিস্ ইনোসেন্স্ ফর এভার। লাইফ ওয়াস্ নেভার দ্য সেম অগেন আফ্‌টার দ্যাট ওয়ার। সেই যুদ্ধের ক্ষত আমাদের জীবনে এখনো দগ্‌দগে"।

জর্জের সঙ্গে কত জায়গায় যে ঘুরেছে ওরা তারপর। ক্যাম্পিং করেছে টারা ভ্যালিতে, লিকুলা লেকের পাড়ে। হাইকিং করেছে কতবার উইল্‌সন্‌স্ প্রমের বিপুল বিস্তরণের মাঝে। একাধিকবার ক্যারাভানে থেকে ফিলিপ আইল্যান্ডের সমুদ্র সৈকতে প্রতিদিন হেঁটেছে দীর্ঘকাল ধরে। সূর্যাস্তের পরে, সমুদ্রের অগুন্‌তি ঢেউয়ের ওপর বসে ভেসে আসা ছোট ছোট ফেরি পেংগুইনদের পাড়ে উঠে এসে, টলতে টলতে বাসার দিকে হেঁটে চলা দেখেছে ওরা। পেটভর্তি মাছের ভারে, সন্তুলন বজায় রাখতে গিয়ে রীতিমত বেগ পেতে হয় ওদের। ওদিকে অপেক্ষমান শাবকদের মুখে খাবার তুলে দেবার আগ্রহে বাসায় ফিরে যাবার তাড়াও তখন ওদের প্রবল।

* * * * *

(চলবে)

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

ধারাবাহিক উপন্যাস

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১৮

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতে, থাকতে পাপানের চোখের কোণগুলো ভিজে এল। কিছুক্ষণ হল ভোর হয়েছে। সমুদ্রের কাছাকাছি বলে গঙ্গাটা এখানে বেশ চওড়া। কলকাতায় গঙ্গা বলতে পাপান যা বুঝত, তার থেকে একদম আলাদা এখানে নদীর চেহারাটা। চলতে-চলতে নদীটা যেন হঠাৎই বড় হয়ে গেছে। ঠিক তার মতোই, ভাবল পাপান। আজ নিয়ে সতের দিন হল মা চলে গেছে। পাপান ভাবল বটে মা চলে গেছে, কিন্তু কোনওমতেই কথাটা বিশ্বাস হয়না তার। মা-র অসুখ হয়েছে, মা আর বাঁচবেনা, সবই বুঝেছিল পাপান, মেনে নিয়েছিল, কিন্তু আর না বাঁচার সম্ভবনার সঙ্গে মারা যাওয়ার অনেক তফাৎ। এতটাই যে একটি মানুষ হঠাৎ করে উধাও হয়ে যেতে পারে অন্যদের জীবন থেকে তার যাবতীয় স্পর্শ আর অনুভূতির প্রকাশ নিয়ে। সেদিন শিঞ্জিনি মাসি এসে সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলেনি তাকে, শুধু সটান বিছানার উপর বসে পড়ে সজোরে জড়িয়ে ধরেছিল হালকা জ্বর গায়ের তাকে। অনেকক্ষণ আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়েছিল শিঞ্জিনিমাসি, কিন্তু একদম নিঃশব্দে, একটি শব্দও যেন উচ্চারণ বাহুল্য হয়ে উঠবে। প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেলেও পাপান দ্রুত বুঝে নিয়েছিল ভেতরের কথাটা। শিঞ্জিনি মাসির বুকে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করেছিল সে, তারপর খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিল, ''বাপি ?'' — ''হাসপাতালে'' খুব আলতো জবাবটা দিয়ে শিঞ্জিনিমাসি মুখটা তুলে ধরেছিল তার বলেছিল ''চ পাপান''। পাপান দেখেছিল শিঞ্জিনিমাসি খুব জোরে ঝেঁপে-কেঁপে উঠছে। পাপানের কান্না পায়নি, মামার বাড়িতেও নয়, হাসপাতালেও নয়। কেমন একটা ঘোর ঘিরে রেখেছিল তাকে। বাপি খুব কাঁদছিল, একদম বাচ্চারা যেমন কাঁদে, ঠিক তেমনি করে মা কে আঁকড়ে ধরে কাঁদছিল বাপি। পাপান সেই অবস্থাতেও একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল সেদিন। শিঞ্জিনিমাসি কিন্তু একবারও বাপিকে সামলাতে এগিয়ে যায়নি, পাপানকে পাশে নিয়ে খুব শান্তভাবে বসেছিল, যেন পাপান তার একমাত্র দায়িত্ব। বাপির এক বন্ধু এসেছিল সেদিন। পাপান আগে কখনও দেখেনি তাকে। মাঝারি চেহারার গাট্টাগোট্টা একটা মানুষ, মাথার চুল মুখের দাড়ি সবই যেন কিছুটা অগোছালো, সামনের দুটো বড়-বড় দাঁত একটু বেরিয়ে আছে, গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী আর সাইজে বড় জিনসের মানুষটার নামটা জানা ছিল পাপানের। জয়। জয়কাকুই সামলে রাখছিল বাপিকে, হাসপাতাল আর শ্মশানের যাবতীয় ঝঞ্জাট পোয়াচ্ছিল। আরও একজন মানুষ এসেছিলেন শ্মশানে। খুব সুন্দর দেখতে, দেখলেই বোঝা যায় খুব বড়মাপের চাকরি করেন। ভদ্রলোক বাপির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, কোনও কথা বলেননি, বোধহয় বাপিকে ওই অবস্থায় আর বিরম্বনায় ফেলতে চাননি। তারপর ধীরপায়ে এসেছিলেন পাপানের কাছে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। পাপান বিস্মিত হয়ে তাকাতে একটু হেসে বলেছিলেন, ''ব্রেভ গার্ল, অল ওয়েজ বি ব্রেভ''। পাপান ঠাওর করতে পারছিলনা ভদ্রলোকের পরিচয়। ভদ্রলোক কাছে এসে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল শিঞ্জিনিমাসি। পাপানের পিঠে আরেকবার হাত বুলিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক শিঞ্জিনিমাসিকে বলেছিল, ''তুমি তো বোধহয় আজ আর . . . এখানেই . . . আসি''। শিঞ্জিনিমাসি আলতো মাথাটা নাড়তে বড়-বড় পায়ে চলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। পাপান জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাতে শিঞ্জিনিমাসি একটু হেসে জানিয়েছিল পরিচয়টা, ''অনিন্দ্য ''। আর এসেছিল ইমন। খবরটা পেয়েই হাসপাতালে, পাপানের পাশে। তবে বেশীক্ষণ থাকেনি। পাপানের কেমন যেন মনে হয়েছিল ইমন একটা অস্বস্তিতে আছে। চলে যাওয়ার সময় কেবল পাপানের হাতে হাত রেখে বলেছিল, ''আসি। মন খারাপ হবে জানি, কেঁদোনা''। না, পাপান কাঁদেনি। এমন কি মুখাগ্নি করবার সময়ও নয়। রাত্রে বাড়ি ফিরে আরেকদফা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল বাপি। দিস্মা খবরটা শোনবার পর থেকে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, আর ওঠেনি সারা সময়টা। পাপান কিন্তু কাঁদেনি, ভেঙে পড়েনি। শুধু যখন শেষ রাতে আত্মীয়-প্রতিবেশীরা ফিরে গিয়েছিল, যখন শিঞ্জিনিমাসি এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, ''অ্যাই সাহসী মেয়ে, খুব মন খারাপ ?'' তখন আর পারেনি পাপান। শিঞ্জিনি মাসিকে জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। মাথার উপর দিয়ে ড্রি ড্রি শব্দে এক ঝাঁক টিয়া উড়ে যেতে পাপান মনটাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনতে পারল। একটি মানুষ উঠে আসবে গঙ্গার বুক থেকে সিঁড়ির ধাপগুলো ধরে। পাপান চিনতে পারল, সন্ন্যাসী। এত ভোরেই স্নান সারা হয়ে গেল ঋজু প্রৌঢ়টির।

মাথা উঁচু, সারা মুখে দিনের প্রথম রোদ এসে হুটোপাটি খাচ্ছে, সাদা পোশাক ভিজে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে শরীরটাকে। পাপান এইমাত্র খেয়াল করলেও সন্ন্যাসী খুব সম্ভবতঃ আগেই নজর করেছেন তাকে। স্মিত হাস্যে সিঁড়ির উচ্চতম ধাপে বসা পাপানের দিকেই আসছেন তিনি।

— ''কি মা, রাত্রে কোনও অসুবিধা হয়নি তো ? ঘুম হয়েছিল ?'', প্রশ্ন করলেন সন্ন্যাসী।

— ''না, না,'' বলতে বলতে পাপান উঠে দাঁড়ালো। পাপানের আরও কিছু বলতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু কেমন যেন একটা সংকোচ হচ্ছে মানুষটির ব্যক্তিত্বের সামনে, বলে উঠতে পারছে না।

সন্ন্যাসীই অবশ্য আর তেমন সুযোগ দিলেন না। ''বেশ, বেশ, মঙ্গল হোক'', বলে একটু হেসে হাঁটা লাগালেন আশ্রমের দিকে। কয়েক পা গিয়ে কি মনে হতে থমকে দাঁড়ালেন। পাপানের দিকে ঘুরতে পাপান খেয়াল করল স্মিত হাসির জায়গায় এখন তার মুখ ভর্তি একটা অন্যরকমের গাম্ভীর্য, সন্ন্যাসী যেন অনেক দূর থেকে কথা বলা শুরু করলেন, । ''তুমি আসাতে আমি খুব খুশী হয়েছি পাপান। আমার তোমাকে ভালো করে দেখবার বড় প্রয়োজন ছিল।'' একটু যেন কি ভাবলেন, তারপর এক পা এগিয়ে এসে বাকি শব্দগুলোকে মুক্তি দিলেন, ''নাঃ তুমি পারবে। নীলের ধরণটাই অসহায়। ওর পাশে তোমার মত একজনের প্রয়োজন ছিল। তুমি সাহসী, তুমি স্থির, বিবেচক। খুব ভালো, খুবই ভালো।''

কথাগুলো বলে চলে যাওয়ার উপক্রম করেই গেলেন না সন্ন্যাসী, আরও কিছু কথা বলা যেন বাকি রয়ে গেছে তাঁর, ''বিবেচক হলেও তুমি এখনও অপরিণতমনস্ক। তোমায় একটা উপদেশ দিয়ে রাখা আমার কর্তব্য। শিঞ্জিনিকে আমি খুব গভীর ভাবে চিনি, বুঝতে পারি। এ' পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য প্রাণ জন্ম নিচ্ছে নানা প্রান্তে। প্রতিটি প্রাণই ঈশ্বরের অংশ। তবু তারই মধ্যে কোনও কোনও প্রাণ আসে, যাদের সৃষ্টি হয় ঈশ্বরের সরাসরি হৃদকমল থেকে। তাদের ধর্ম, তাদের চরিত্র, লক্ষ্য, জীবনদর্শন সব কিছুই অন্য আর পাঁচজনের থেকে অন্যরকম। তারা মানুষের ভালো করতে আসে, তাদের দিকে একটু মন দিয়ে তাকালেই টের পাওয়া যায় তাদের অন্তরের দ্যুতি। শিঞ্জিনি সেই গোত্রের। তোমার অশেষ সৌভাগ্য যে এই সংকটের মুহূর্তে ওর মতো একজন মানুষকে তুমি পাশে পেয়েছ। দেখো, কখনও ওকে ভুল বুঝোনা, অবমাননা করো না। পারো তো ওকে আঁকড়ে থেকো ও তোমার সারাজীবনের অশেষ আশ্রয় হয়ে উঠবে। তোমার এবং তোমার বাবার। তোমার বাবাকে আমি পুত্রবৎ স্নেহ করি পাপান। ওকে আমি যেভাবে চিনি আর কেউই সেভাবে ওকে চেনেনা। না, একটু ভুল বললাম। খুব সম্ভবতঃ খুব সম্ভবতঃই বা বলি কেন, নিশ্চিতভাবেই আরও একজন চেনে ওকে শিঞ্জিনি। শিঞ্জিনির বন্ধুত্বের আশ্রয় তোমার বাবার জীবনে অত্যাবশ্যকীয়। আমি সন্ন্যাসী, ক্রমাগতঃ ঈশ্বর সাধনা আমাকে অন্য এক দৃষ্টি দিয়েছে। সে দৃষ্টিতে আমি দেখতে পাই, নীলের পরিস্ফুট হওয়া এখনও বাকি। নীল নিজেও জানেনা জীবনে এখনও কত পাপড়ি সে মেলবে ও অবোধ শিঞ্জিনির আশ্রয় ওর প্রয়োজন। কোনও মূল্যেই ওকে তা থেকে বঞ্চিত করোনা, যে প্রতিকূল পরিস্থিতিই সামনে আসুক'', একদমে এতগুলো কথা বলে সন্ন্যাসী একটু চুপ করলেন, পাপান লক্ষ্য করল, তাঁর মুখের ভাবে গাম্ভীর্য কেটে গিয়ে এখন আর সৌম্য ভাব, ''আমি আজ তোমায় যে কথাগুলো বললাম, জানিনা, তার কতটা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। হয়তো আরেকটু বড় হলে এ'সব কথার কার্যকারণ তোমার কাছে পরিস্কার হবে। আজ শুধু এ'টুকু বলতে পারি, পারো তো আমার কথাগুলো মনে রেখো। তাতে কার ভালো, কার মন্দ হবে বলতে পারিনা, ছোট-ছোট ভালো মন্দের হিসাব কষতে বসাটা আমার কাজ নয়, শুধু এ'টুকু জানি এ' ঈশ্বরের অভিপ্রায়''। ডান হাত বাড়িয়ে পাপানের মাথায় রাখলেন সন্ন্যাসী, অস্ফূটে বললেন, ''শুভ হোক'', তারপর একটু হেসে পিছন ফিরে বড় বড় পায়ে ফিরতে লাগলেন আশ্রমের দিকে, পাপানকে গঙ্গার তীরে একা রেখে। সন্ন্যাসী চলে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পাপান। সন্ন্যাসীর উচ্চারণ করে যাওয়া শব্দগুলো তার কানের চারপাশে বাজতে লাগল। নিজের মনেই শব্দগুলোর মানে হাতড়াতে থাকল পাপান। কথা গুলো যেন খুব চেনা, বোঝবার মতই, তবু যেন ঠিকমতো চিনে ওঠা যাচ্ছেনা। কিছু কিছু জানা কথা যেমন কাছে আসতে আসতেও দূরে আবছা হয়ে যায় তেমনই। তবে একটা কথা সন্ন্যাসী ঠিক বলেছেন, ভাবল পাপান, শিঞ্জিনিমাসি বাবাকে খুব ভালো বোঝে। বাবার খুব ভালো বন্ধু শিঞ্জিনিমাসি। আচ্ছা, মা কি বাবার অত ভালো বন্ধু ছিল ? না বোধহয়। না বাবার কাছে কেমন যেন ছোট মেয়ের মত ছিল, মাঝে মাঝে পাপানের মনে হত মা তার মা নয়, একটু বড়

দিদি, এমনই ছেলেমানুষ ছিল মা। মা কে একবার জড়িয়ে ধরতে খুব ইচ্ছা করল পাপানের। পাপান জোর করে নিজের মনটাকে অন্যদিকে ফেরাল। তার জীবনে এখন একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে। এই তো কালই, বাবা আর শিঞ্জিনিমাসির সঙ্গে সে এখানে এসেছিল বটে, কিন্তু থাকার কথা ভাবেনি। কিন্তু এসে বড় ভালো লেগে গেল তার। মনে হল একদিন থেকে গেলে বেশ হয়। বাপি তো মহা মুশকিলেই পড়ে গেল। বাড়ি ফেরবার তাড়া ছিল। শিঞ্জিনিমাসি পাপানের ইচ্ছাটা ঠিক বুঝেছিল, বাপির অসুবিধাটাও। তাই বাপিকে নিশ্চিন্তে চলে যেতে বলে পাপানকে নিয়ে রয়ে গিয়েছিল আশ্রমে। শিঞ্জিনিমাসিটা এত ভালো। খুব ভালোবাসে পাপানকে, বাপিকেও। বাপি ও খুব ভরসা করে শিঞ্জিনিমাসিকে। কালকের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল পাপানের। তখন বিকেলটা শেষ হয়ে এসেছে। পাপান বাগানে ঘুরতে ঘুরতে এসে দাঁড়িয়েছিল গঙ্গার ধারে। দেখেছিল নিচের ধাপে পাশাপাশি বসে আছে বাপি আর শিঞ্জিনিমাসি। বাপি মাথা নিচু করে বসেছিল, বোধহয়, কাঁদছিল। শিঞ্জিনিমাসি বাপির পিঠে আলতো হাত রেখে খুব নরম ভঙ্গিতে কিছু বলছিল। একসময়ে মাথা তুলেছিল বাপি, সজোরে চেপে ধরছিল শিঞ্জিনিমাসির হাত আর শিঞ্জিনিমাসি ঠোঁট দুটো আলতো করে বাপির কপালে। ঠিক যেমন মা পাপানের কপালে ঠেকিয়ে চুমু খেত, ঠিক তেমনি। পাপানের খুব ভালো লেগেছিলো, দাঁড়িয়ে না থেকে ওদের পাশে বসতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু পাপান বুঝেছিল এখন ওখানে যাওয়া চলেনা, সবসময়ে সব জায়গায় যেতে নেই। কখনও কখনও না যাওয়াটাই বড় হয়ে ওঠে।

একটা কথা কিছুতেই পরিস্কার নয় পাপানের কাছে। ইমনের শিঞ্জিনি মাসির উপর এত রাগ কেন ? আর বাপির সঙ্গে শিঞ্জিনি মাসির বন্ধুত্ব নিয়েই বা ওর আপত্তি কিসে ? আজকাল প্রায়ই এ' বিষয়ে আলোচনা করতে চায় ইমন, যেন পাপানের সঙ্গে তার আর কোনও বিষয়েই কথা বলবার নেই কোনও সন্ধ্যায় ফোন করে ওই একই কথা বলে যাচ্ছিল, হাজারো প্রশ্ন, সে সব প্রশ্নের চেহারা বড়ই ব্যাকাচোরা। বিরক্তি লেগেছিল পাপানের। একটু কথা বলেই ফোনটা রেখে দিয়েছিল সে। ইমন হয়তো একটু রাগ করছিল, কিন্তু পাপানের তখন কথা বলতে আর একটুও ভালো লাগছিল না। ইমনটা কেন বোঝেনা যে পাপান তাকে খুব ভালোবাসে। যাকে ভালোবাসে, তার সম্বন্ধে ছোট ভাবতে মানুষের কষ্ট হয়না ?

পাপানের তো হয়। ইমনটা কিছু বোঝেনা। বড্ড গোঁড়া আর একরোখা। ইমনের জন্য ভীষণ মন কেমন করে উঠল পাপানের। ইমনটার সঙ্গে এখন অনেকটা গল্প করতে ইচ্ছা করছে তার। পাপান ইমনের নম্বর ডায়াল করতে শুরু করল।

# # #

কিছু একটা হয়েছে পাপানের, শিঞ্জিনি বুঝতে পারছে, ধরতে পারছেনা। সকালের পর থেকেই গুম মেরে আছে মেয়েটা। জয়িতার জন্য মন কেমন করছে ? নাকি অন্য কিছু, ওই ছেলেটা, যে সেদিন হাসপাতালে এসেছিল ? সেদিন থেকেই ছেলেটাকে নিয়ে একটা অস্বস্তি আছে শিঞ্জিনির মনে।

অত শোকের মধ্যেও কেন জানিনা শিঞ্জিনির মনে হচ্ছিল ছেলেটা তার চোখ দিয়ে কোথাও তাকে বিদ্ধ করছে। মানুষ যতই চেপে রাখবার চেষ্টা করুক, শিঞ্জিনি দেখেছে অপছন্দ ঠিক ধরা পড়েই যে অপছন্দ করছে তার মুখে, যাকে করছে তার চোখে। কিন্তু কেন ? ছেলেটাকে তো চেনেও না শিঞ্জিনি। শিঞ্জিনি ব্যাপারটাকে আর পাত্তা দিতে চাইলনা। সে আরেক দফা পাপানের দিকে তাকালো। মন্দিরের সাদা চাতালটায় ঝিম মেরে বসে আছে মেয়েটা, যেন খুব গভীরভাবে কিছু ভাবছে। জিজ্ঞাসা করবে একবার, কি হয়েছে ? নাকি নিজস্ব সময় দেবে ওকে ? নিজস্ব সময় — কথাদুটো মনে হতেই শিঞ্জিনির ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। হ্যাঁ, তাদের সবার এখন নিজস্ব সময়ের প্রয়োজন। সহজ সরল মেয়েটা অসুখ বাঁধিয়ে দুম করে সরে গিয়ে তাদের সবাইকে হিড়হিড় করে টেনে এনে দাঁড় করিয়েছে জীবনের নতুন মোড়ে। অদ্ভুত এ মোড় ? পিছনে পড়ে আছে হেঁটে আসা ছোট বড় পথগুলো আর সামনে আলো-অন্ধকারে শুরু হওয়া কিছু রাস্তা। কি করতে পারে শিঞ্জিনিরা ? পিছন ঘুরে ফেলে আসা পথে ফিরে যাবে যে যার মতো ? যেতেই পারে, কিন্তু তাহলে সময়ের গর্ভে ঘ্রাণ হয়ে থাকা গল্পটা ? তার কি হবে ? একটা সম্পূর্ণ নতুন গল্পের আভাস পাচ্ছে শিঞ্জিনি জীবনে। তাহলে কি সামনের পথের আলো-আঁধারিটা গায়ে মেখে দুর্যয় সাহসে হেঁটে যাওয়াটা ভবিতব্য ? কিন্তু কি আছে ওই আবছায়ার পরে ? আলো না

অন্ধকার ? শিঞ্জিনি ভেবেছে এ' নিয়ে । অনেক ভেবেছে । ভেবে দেখেছে । ভবিষ্যতের মনে যাই থাকুক তাকে নুতন পথটাতেই হেঁটে যেতে হবে । এ সিদ্ধান্তের কারণ গুলো খুব স্পষ্ট তার কাছে । জীবনে যে পথে সে ফেলে এসেছে, সে পথে ফিরে গেলে নতুন করে আর কিছু পাওয়ার নেই তার । যা পাবে, তা আগেও পেয়েছে, এখনও পাবে অথচ তা পাওয়ার ইচ্ছা তার ছিলনা কোনও কালে । তার চেয়ে সামনের দিকে হাঁটা ভালো । জন্মান্তরে শিঞ্জিনির বিশ্বাস নেই, পাপ পুণ্যের ধারণাটাও তার কিছুটা আলাদাই, তার কাছে জীবন মানে নানা রঙের কিছু মুহূর্তের সমষ্টি । জীবনের পারে কি আছে সে জানেনা, আছে বলে তার আদৌ প্রত্যয়ও নেই, তবে যেকটা দিন বেঁচে আছে কেন পরীক্ষানিরীক্ষা করবেনা নিজেকে নিয়ে ? কেন জীবন থেকে কুড়িয়ে নেবেনা আরও কিছু নতুন নতুন মুহূর্ত, জীবনেরই জন্য ? আরও একটা কথা, খুব সম্ভবতঃ সেটাই সবচেয়ে বড় কারণ । শিঞ্জিনি জানে, তার এই নতুন পথে চলাটা আরও একটা মানুষকে নতুন পথে চলতে ভরসা যোগাবে । সে মানুষটা এখন ক্ষত-বিক্ষত, দুমড়ে মুড়ে একাকার । দীর্ঘদিন বন্ধ খাঁচায় বন্দী থাকা মানুষটা সবে তার উড়ান শুরু করেছিল । এখন এক ভয়ঙ্কর ঝড় এসে কোণঠাসা করে দিয়েছে তাকে, সে মানুষটার জীবনের সামনেও মস্ত এক প্রশ্নচিহ্ন এখন । তাকে গভীরভাবে চেনে শিঞ্জিনি জানে একলা ওড়বার ক্ষমতা তার নেই এই মুহূর্তে । হয়তো শিঞ্জিনিকে নতুন আকাশ হতে দেখলে সে ও পালক গুজবে নতুন করে । শিঞ্জিনিকে সে তার আকাশ আর বাসা দুই-ই হতে হবে । আর ওই ছোট মেয়েটা যার পায়ের তলায় মাটি নেই, যার আশপাশে এখন কেবল ভূমিক্ষয় ? শিঞ্জিনিকে বাঁচতে হবে, নতুন আর বৃহত্তর কারণে বাঁচতে হবে এখন থেকে । তাতে যে পাশে থাকবার থাকল, যে যাওয়ার সে গেল । শিঞ্জিনি সে নিয়ে আর চিন্তা করবেনা । শিঞ্জিনি ধীরে ধীরে পাপানের দিকে এগোল । সকাল থেকেই কথা বলতে বিশেষ ভালো লাগছে না পাপানের । ঝড়ের পরে প্রকৃতি যেমন দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকে, কেমন যেন সবই থাকে অথচ কোনওটাই ঠিক জায়গায় নয়, এমনকি কোনটা কোথায় ছিল সেটা অবধি গুলিয়ে যায়, পাপানের মনটা ঠিক তেমনি হয়ে আছে । হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাঁচের বাসনের অজস্র টুকরোর মত ছত্রাকার হয়ে রয়েছে চারিদিক । সকাল থেকে পাপান অনেকবার চেষ্টা করেছে টুকরো-গুলোকে হাতে তুলে সযত্নে জুড়বার, সুবিধা হয়নি, প্রতিবারই হাত থেকে ছিটকে গেছে ভাঙা মনটা । আসলে শোকের আঘাতে ভেঙে পড়া মন গুছিয়ে তোলা সহজ, সে শোক যতই বিধ্বংসী হোক না কেন । কিন্তু মনের গায়ে যদি স্বপ্ন জড়ানো থাকে আর মনের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নগুলোও যদি চুরচুর হয়ে যায়, তখন ক্ষতচিহ্নহীন ভাবে সে মন আবার জুড়ে ফেলা ভারী মুশকিল ।

দানবের মত ছুটে যাচ্ছে ভারী বাসটা । শেষ দুপুরের বাস বলেই বোধহয় ভীড়টা একদমই নেই । জানলার বাইরের প্রকৃতির হলদে সবুজ মেটে মোটিফটা খুব দ্রুত সরে সরে যাচ্ছে । পাপানের মনে হল, পাছে পাপানের কষ্ট লেগে বিবর্ণ হয়ে যায়, তাই উল্টো দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে পৃথিবী । পাপান বাঁদিকে মাথাটা ঘোরালো । পাশের সিটটাতেই মাথা নিচু করে স্থিরভাবে বসে আছে শিঞ্জিনিমাসি । শিঞ্জিনিমাসিও অনেকক্ষণ ধরে খুব চুপচাপ হয়ে আছে । যেন গভীরভাবে কি একটা ভাবছে ? কি সেটা ? পাপান ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না, যদিও আন্দাজ একটা করতে পারছে । তারা আশ্রম থেকে বেরোনোর আগে সন্ন্যাসী নিজের ঘরে ডেকেছিলেন শিঞ্জিনিমাসিকে । বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা হয়েছে দুজনের । বাগানে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে পাপান দেখেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় শিঞ্জিনিমাসির মুখ গম্ভীর । সেই থেকেই মুখটা অমন হয়ে আছে । তবে কি সকালে তাকে বলা কথাগুলো শিঞ্জিনিমাসিকেও বলেছেন সন্ন্যাসী হয়তো । পাপানের হঠাৎ খুব অবাক লাগল । আচ্ছা, সন্ন্যাসী মানে তো সবরকম মায়া ত্যাগ করা একটা মানুষ । তাহলে উনি সন্ন্যাসী হয়ে পাপানদের সংসারের ব্যাপারে এত চিন্তা করছেন কেন ? সন্ন্যাসীর কাজ তো তা নয় । হঠাৎ মনটা ঝাঁকুনি দিয়ে শিঞ্জিনিকে প্রশ্নটা করেই ফেলল পাপান । শিঞ্জিনি প্রশ্নটা শুনেও মাথা তুললনা কিছুক্ষণ । তারপর ধীরে ধীরে তাকালো পাপানের দিকে, ''সত্যিকারের সন্ন্যাসী বলেই বোধহয় ভাবতে পারছেন । উনি মায়া বিসর্জন দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সংকীর্ণ মায়া । কিন্তু মানুষকে ভালোবাসবার রাজপথের ধারে-ধারে যে প্রাকৃতিক মায়ারা ছড়িয়ে থাকে, তাদের উনি বিসর্জন দেবেন কেন ? সে মায়া তো মানুষের মনের নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি'', একটু চুপ করে থেকে শিঞ্জিনি কথাটা শেষ করে, ''আসলে, আমরা সাধারণ মানুষেরা মায়াজড়াই নিজের স্বার্থে, আর উনি মায়া বিলোচ্ছেন অন্য মানুষদের স্বার্থে, তফাৎ টা এখানেই, বুঝলি ?''

''বুঝলাম'' পাপান মাথা ঝাঁকায়, ''ঠিকই বলেছ'', তারপর লম্বা দৌড়ের আগে যেন দম নিচ্ছে, এ'রকম করে শ্বাস নিয়ে হঠাৎই সকাল থেকে মনের মধ্যে ঝড় তুলে যাওয়া প্রশ্নটা করে ফেলে সে, ''আচ্ছা শিঞ্জিনিমাসি, তুমি তো এত বোঝো,

ভাবো, একটা কথা বলো তো, কেউ যদি তোমাকে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকে, যদি সমানে তোমাকে অনর্থক আঁচড়েকামড়ে দিতে থাকে, তবেও কি সে তোমার বন্ধু থাকে ? মানে তাকে কি আদৌ তোমার বন্ধু বলা যায় ? কিংবা আগে থাকলেও এখন কি আর সেই বন্ধুর হাত ধরে থাকা উচিৎ না তাকে ত্যাগ করাটাই ঠিক কাজ ?''

শিঞ্জিনি বড় অদ্ভুতভাবে হাসে । চশমার আড়ালের দীপ্ত চোখ দুটো যেন এক্স রে মেশিনের মত পাক খেতে যাচ্ছে তার মনের সারা শরীরে, পাপান টের পায় । পাপান অস্বস্তিতে পড়ে যায় ।

''খুব ভালো প্রশ্ন করেছিস পাপান'', শিঞ্জিনিমাসি চোখ দুটো পাপানের মুখের উপর থেকে না সরিয়েই বলতে শুরু করে, ''দ্যাখ এমনিতে আমরা যা শিখি, জানি, তাতে মনে হয় যেন বন্ধুত্ব আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য একটা বিষয়, কোনও মূল্যেই তা হারানো যেতে পারেনা, বন্ধু মানেই চিরদিনের । না রে, ব্যাপারটা আসলে তা নয় । কোনও মানুষই কোনও মানুষের জীবনে অবিচ্ছেদ্য বা চিরদিনের হতে পারে না। চিরদিনের যা তা হল চেতনা থেকে ক্রমাগত জন্ম নিতে থাকা অনুভূতিরা, বাকি সবই আপেক্ষিক । আমাদের জীবনে সবসময়েই নানা ঘটনা ঘটে যেতে থাকে । আমরা ঘটনাগুলোকে দেখি নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আর সেই দেখার নিরিখেই দেখতে থাকি আমাদের জীবনে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকেও । কাজেই, আমাদের চোখে ওই মানুষগুলোর মূল্যায়ন পাল্টে যাওয়াটা একটুও অস্বাভাবিক নয় । আসলে;, একটা মানুষ আমার জীবনে কি ভাবে জড়িয়ে রইল, অথবা জড়িয়ে রইল কিনা, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় । গুরুত্বপূর্ণ হল, সেই মানুষটার প্রতি আমার যে অনুভূতি, সেটা আমায় জড়িয়ে রইল কিনা । মানুষ তার স্বভাবসিদ্ধ সংকীর্ণতায় অনেক সময় অন্যকে আঘাত দিয়ে ফেলে, সেটাকে অত গুরুত্ব দিতে নেই, যদি তার প্রতি আমার অনুভূতিটা খাঁটি হয় ।'' শিঞ্জিনি একটু থামে, ''তবে একটা কথা, যদি সে মানুষটা ক্রমাগত ঃ এমন কিছু করতে বা বলতে থাকে, যা আমার অর্জিত মূল্যবোধ আর আদর্শের পরিপন্থী তবে সেই বৃহত্তর আদর্শের স্বার্থে, যত কাছেরই হোক না কেন, সেই ব্যক্তি মানুষটিকে অনেক সময় ত্যাগ করতেই হয় সেখানে তখন চেতনা থেকে আরও এক ম্যাগনিফাইং গ্লাসকে তুলে আনতে হয়, তার নাম বিবেচনা বোধ । বিবেচনাবোধ মানুষের জীবনে এমন এক স্থান অধিকার করে আছে যা নিছক আবেগকে পরিশুদ্ধ করে মানুষের চিন্তা শক্তিকে স্বচ্ছ করে তোলে । তখন বৃহত্তর দিয়ে ক্ষুদ্রতরকে দূরে সরিয়ে দেওয়াই উচিৎ । যে কোনও মানুষের ক্ষেত্রেই এটা করা উচিৎ'', শিঞ্জিনি একটু চুপ করে থেকে বলে, ''এমন কি সে মানুষের নাম ইমন বা অনিন্দ্য হলেও'' ।

পাপান চমকে ওঠে, ''তুমি ! তুমি কি করে . . . জানো, ও . . .'' পাপানকে কথা শেষ করতে দেয়না শিঞ্জিনি, ''থাক, ঘটনা যে, ঘটনার কোনও গুরুত্বই নেই আসলে, অনুভূতি দিয়ে সব কিছু বিচার করে দেখিস পাপান । অনুভূতি এমন একটা ছাঁকনি, যাতে যে থাকবার, সে থাকবেই, আর যে নিচে পরবার, তাকে আর খুঁজতে যাওয়ার দরকারই পড়বেনা''।

পাপান চুপ করে বসে থাকে । ঠিকই বলছে শিঞ্জিনিমাসি কথাগুলো । তার মনটা এখন হালকা হয়ে আসছে । মনে হয়, এবার হয়তো একটু চেষ্টা করলে সে ভাঙা টুকরোগুলোকে জুড়ে ফেলতে পারবে । কিন্তু মনের মধ্যে আবার মেঘেরা এসে জমতে শুরু করেছে । সত্যিই কি এ'ভাবে একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে পারে ?

প্রচন্ড দৌড়াদৌড়িটা থামিয়ে হাঁফাচ্ছে বাসটা । ডায়মন্ডহারবার এসে গেছে । অনেক লোক উঠছে এখানে, নামছেও কিছু লোক । মনটাকে সেদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করল পাপান । হচ্ছে না, প্রশ্নটা ছটফট করে বেড়াচ্ছে মাথায় ।

— ''আচ্ছা, শিঞ্জিনিমাসি, সত্যিই কি প্রিয় কাউকে এ'ভাবে ত্যাগ করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ? প্রশ্নটা করেই ফেলল পাপান ।''

শিঞ্জিনি গঙ্গার দিকে দেখায়, ''গঙ্গাটাকে দ্যাখ পাপান । সেই কোন পাহাড় থেকে নেমে এসেছে । ভেবে দ্যাখ ও যখন সরু একটা নদী হয়ে রয়েছিল পাহাড়ে, তখন হয়তো কোনও ঝুড়ি, তীরের কোনও গাছের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছিল ওর, হয়তো ও নদীর ধারের কোনও ঘাটকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিল । কিন্তু তা বলে ও থেমে থাকেনি । নদীটা ওর আরও বড় কাজ করবার রয়েছে । তাই ও বয়ে এসেছে সমতলে । নিজের বুকের পলি দিয়ে গড়ে তুলেছে বসতি সভ্যতা । আর দ্যাখ, এটা

করতে করতে ও কত বড়, কত প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। তার মানে তো এই নয় যে ওই ঝুড়ি, ওই ঘাট গুলোকে সে ভুলে গেছে। আছে হয়তো তারা আজও ওর মনের মধ্যে কোথাও। যদিও চোখের সামনে নেই। এটাই তো নিয়ম রে পাপান, না হলে মোহনায় পৌঁছবি কি করে ? নিজেকে নদী না করলে কি মোহনায় সমুদ্র মেলে রে ? তাহলে যে বদ্ধ জমানো পুকুর হয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে হবে''।

— ''তুমি ? তুমি কি করো শিঞ্জিনি মাসি ?'' পাপান শিশুর বিস্ময়ে প্রশ্ন রাখে।

— ''আমি ?'' শিঞ্জিনি মাথাটা নামায়, ''আমি কি করি সেটা নয় বরং বলি, যে আমি কি করব। তোর জেনে রাখা উচিৎ।'' এবার মাথাটা তুলে সরাসরি পাপানের চোখে চোখ রাখে শিঞ্জিনি, ''অনেক ভেবে দেখেছি, আমি নদী হব''।

এ'ভাবে আর ক'দিন ? চিন্তাটা আবার মাথায় ফিরে আসতেই শীর্ষ অস্থিরতাটা আবার নিজের মধ্যে টের পেল। ক'দিন ধরেই চিন্তাটা কেমন যেন মাথার উপর চেপে বসে আছে। রুমকি মরে যাওয়ার পর থেকে একটা ঘোরের মধ্যে যাচ্ছিল জীবন টা। দিনগুলো আসত, চলে যেত, ক্যালেন্ডারের পাতাতেই কেবল এগোত সময়টা। শীর্ষর জীবনে নয়। আসলে নিজেকে নিয়ে ভাবতে ভালোই লাগতনা শীর্ষর। একটা ঘেন্না ধরে গিয়েছিল সবকিছুর উপরে। না, ঠিক ঘেন্নাও নয় বোধহয়, একটা কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব, যেন দিনগুলো এলেও পারে আর না এলেও পারে, চলে গেলেও পারে আর নাও, শীর্ষর যেন কিছুতেই যায় আসেনা। জীবনটা যে অনেক লম্বা, মাথায় থাকত না শীর্ষর। তার খালি মনে হত, এই তো কেটেই যাচ্ছে, আর কি। মাথার মধ্যে সবসময়ে যেন কি একটা দপদপ করত, একটা ছটফটানি, যেন মাথার ঘিলু-টিলু গুলো খালি ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক কোনও কারণ ছাড়াই, সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা ঘেঁটে যাওয়া ভাব।

গত কয়েকদিন হল শীর্ষর এ'ভাবে বাঁচতে আর ভালো লাগছেনা। আগেও ভালো লাগছিলনা বরং বলা ভালো, এখন এ'ভাবে বাঁচতে খারাপ লাগছে। শীর্ষর খালি মনে হচ্ছে, যদিও তার জীবনের এখনও তেমন কোনও মানে নেই, তবুও এ'ভাবে বাঁচবারও তেমন কোনও মানে হয়না। জীবনে একটা মানে খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা করছে ইদানীং মাঝে মাঝেই। আসলে, শীর্ষ দেখেছে যে যার মতো করে সবারই বাঁচবার একটা নিজস্ব মানে আছে। তার বাবা থেকে শুরু করে তার মা, পাড়ার মুরলী জমাদার থেকে শুরু করে তপাদার সুন্দরী মেয়েটা — সবাই একটা মানে নিয়ে জীবনটা কাটাচ্ছে। এই মানেটাই শীর্ষর জীবনে কোথাও কোনওখানে নেই। অথচ অন্য সব্বার আছে, ফলতার সন্ন্যাসীর ও আবার সোনাগাছির বিউটিরও। বিউটির কথা মাথায় আসতেই শীর্ষর হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। আচ্ছা, হঠাৎ করে সে কদিন ধরে এত মানে খুঁজতেই বা যাচ্ছে কেন ? বিউটির জন্য নয় তো ? কে জানে। হতে পারে। বিউটির কথা সারাদিন খুব মনে পড়ে। খালি ইচ্ছা করে বিউটির কাছে যেতে, বসতে দুটো কথা বলতে, আদর করতে। বোধহয় এই জন্যই নাকি ? হঠাৎ এত মানে মানে করা। কিন্তু কি করবে শীর্ষ ? শীর্ষর নিজের কাছেও এ এক মস্ত প্রশ্নচিহ্ন। চাকরি করবে ? কিন্তু পড়াশুনা কই সেভাবে তার ? ব্যবসা করবে ? কিন্তু পুঁজি ? বাবার কাছে হাত পাতবে ? না, তাতে আজও অসুবিধা আছে শীর্ষর। শীর্ষর ভয়াবহ অতীত ? সেই তো প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়াবে শীর্ষকে, শীর্ষ যতবার নিজেকে নতুন রাস্তায় চালাতে চাইবে, মানুষ তার অতীত জীবনকে খুঁজে বের করবেই, আঙুল তুলে আর ফিসফিস করে বলবেই গুন্ডা, শীর্ষ গুন্ডা, শীর্ষ মস্তান, শীর্ষ সমাজবিরোধী, শীর্ষ তোলাবাজ। এটাই জগতের নিয়ম। মানুষ একটা ভাগ্য নিয়ে হয়তো আসে এ' পৃথিবীতে, তারপর তার বাকি ভাগ্যটা সে নিজেই গড়ে তার কর্ম দিয়ে। সেই গড়ে তোলা ভাগ্যটার নামই ইমেজ। শীর্ষ জানে, এই ইমেজ মানুষকে খালি তাড়া করে বেড়ায়। আগে যখন অন্য জীবন ছিল, শীর্ষ দেখেছে, পাড়ার একই রেস্টুরেন্টে সে রুমকিকে নিয়ে খেতে ঢুকেছে আর অন্য আটপৌরে মানুষরাও ঢুকেছে। শীর্ষকে সবাই যেন আলাদা চোখে দেখত। সে চোখে সমীহ, সে চোখে ভয় আর শংকা, তখন শীর্ষ খুব উপভোগ করত ব্যাপারটা, নিজেকে খুব বড়মাপের কেউকেটা বলে মনে হত। আজ শীর্ষ বোঝে সে সমীহতে শ্রদ্ধা ছিল না, ছিল চাপা ঘেন্না। মানুষ শীর্ষর কোনও অস্তিত্বই ছিল না কারও কাছে, সবার কাছে তার পরিচয় ছিল শীর্ষ গুন্ডা। সে পরিচয় শীর্ষর সারা শরীরে সেঁটে বসে গেছে। আজ যদি শীর্ষ টেনে উপড়েও ফেলতে চায় সে পরিচয়, সমাজ তাকে সে পরিচয়, সমাজ তাকে সে সুযোগ দেবে কি ?

অথচ এখন শীর্ষরও ইচ্ছা করে ভালোভাবে বাঁচতে, আর পাঁচটা মানুষ যেমনভাবে বাঁচছে, ঠিক তেমনি করে। রুমকি তার মনে আজও রয়ে গেছে, কিন্তু একই সঙ্গে পাশাপাশি বিউটির জন্যও একটা আলাদা জায়গা তৈরী হয়েছে। হয়তো সেই জায়গাটা তৈরী হয়েছে শীর্ষর মনে আরও রুমকি আছে বলেই। শীর্ষ যদি রুমকিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারত, তবে বোধহয় সেখানে বিউটিরও কোনও জায়গা হতনা। কিন্তু রুমকি আছে, খুব বেশী করে আছে, খুব বেশী করে আছে, আর শুধু নেই-ই মনটাকে একদম নরম করে দিয়ে আছে, যে নরম মাটিতে ক্রমশঃ ডালপালা মেলে নিজেকে ছড়াচ্ছে বিউটি। বিউটিকে শীর্ষ ভালোবেসে ফেলেছে, শীর্ষ বুঝতে পারে। রুমকিকেও খুব ভালোবাসত শীর্ষ, তবে রুমকিকে ভালোবাসায় আর বিউটিকে ভালোবাসায় একটা তফাৎ শীর্ষ বুঝতে পারে। রুমকিকে শীর্ষ ভালোবাসতে নিজের মত করে, একটা লতানে গাছের মত রুমকি তার পৌরুষকে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু বিউটিকে শীর্ষ ভালোবাসে বিউটির মত করে এখানে আঁকড়ে আছে সে নিজে। বিউটির যেন তার পরম ভরসার জায়গা একটা, বিউটিকে ভর দিয়ে থাকতে পারলেই যেন শীর্ষ সোজা হয়ে থাকতে পারবে, নয়তো নয়। আসলে, শীর্ষ বুঝতে পারছে, যতদিন যাচ্ছে, সে ভেতরে ভেতরে পাল্টে যাচ্ছে। খুব বেশী করে অন্যরকমের হয়ে যাচ্ছে সে। ওই যে ফলতার সাধুবাবা, ওনার প্রতিও একটা টান অনুভব করে শীর্ষ। নীলদার সঙ্গে যাওয়ার পরেও আরও বার-দুই শীর্ষ একলাই চলে গিয়েছিল সেখানে। কেন, শীর্ষ নিজেও গুছিয়ে বলে উঠতে পারবেনা। তবে শীর্ষর যেতে খুব ভলো লেগেছিল, এটা বলতে পারে।

ওই সাধুবাবা লোকটা অন্যরকম, তাকে ঘেন্না করেনা, তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে। তাকে মানুষ বলে ভাবে লোকটা, ঠিক নীলদার মত, নীলদার কথা মনে পড়তেই শীর্ষ মনটা খারাপ হয়ে গেল, ইস্, নীলদার বউটা কেমন দুম করে মরে গেল। বৌদিটার কি ই বা বয়স ছিল ? একটা ছোট্ট মেয়ে . . . নীলদাটা খুব অসুবিধায় পড়ে গেল। তবে ওই যে শিঞ্জিনিদি আছেন না খুব ভালো মহিলা, নীলদা আর নীলদার মেয়েকে কেমন আগলে রেখেছিল। অমন করে কেউ আগলে রাখলে মনের কষ্ট টের পাওয়া যায়। শীর্ষরও যদি এমন কেউ থাকত। আসলে অমন সব বন্ধু নীলদার মত মানুষদের জন্যই জোটে, অমন বন্ধু পেতে গেলে মানুষকেও নীলদা হতে হয়, শীর্ষ গুন্ডা হলে চলেনা। তবু, তবু, তবু . . . . শীর্ষর ভালো থাকবার স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে। আর সে স্বপ্নে ঘোরাফেরা করতে থাকে বিউটি। না, বিউটি নয়, বিউটিকে আজ থেকে অর্পিতা বলে ডাকবে সে। বিউটি বলেছিল একদিন, এ' লাইনে আসবার আগে তার নাম ছিল অর্পিতা, বিউটির বাবা খুব শখ করে নাকি দিয়েছিল। ''তাহলে নামটা পাল্টাতে গেলি কেন ?'' শীর্ষর প্রশ্ন শুনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল বিউটি, ''ওসব নাম এখানে চলে না গো, এখানে বিউটি, চামেলি এ'সব নাম রাখতে হয়, তাই-ই নিয়ম''। হোক নিয়ম, শীর্ষ যাকে ভালোবাসে, সে আর ওই গলির বিউটি নয়, সে অর্পিতাই। শীর্ষর এখনই বিউটিকে অর্পিতা বলে ডাকতে খুব ইচ্ছা করল। সে মোবাইলটা হাতে তুলে খুব ধীরে ধীরে কন্ট্যাক্টস্ গিয়ে বিউটির নামটা এডিট করে অর্পিতা করল আর তারপর ডায়াল করল সে নম্বরে।

ওপাশ থেকে, ''হ্যালো'' টা ভেসে আসতেই শীর্ষ খুব আলতো করে বলল, ''অর্পিতা, আমি শীর্ষ''। কয়েক মুহূর্তের জন্য ওদিক থেকে কোনও শব্দ পাওয়া গেলনা যেন হঠাৎ করে সব কথারা ফুরিয়ে গেছে ওদিকটায়, তারপর খুব অস্ফুটে গলাটা পাওয়া গেল, ''কি বললে ? আবার বলো। আরেকবার।''

''অর্পিতা আমি শীর্ষ বলছি, আমার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় একটা সিনেমা দেখতে যাবে ?'', শীর্ষ এবার খুব স্পষ্ট করে বলল কথাগুলো। বিউটি ফোনের ওপাশটায় হু হু করে কেঁদে ফেলল। খুব কাঁদছে মেয়েটা, কাঁদুক। শীর্ষ টের পেল, তার চোখের কোণগুলোও কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করে উঠতে শুরু করেছে।

# # #

পূজা হাতে ধরা এ-ফোর কাগজটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সাদা কাগজটায় ছোট ছোট অক্ষরে একগাদা কালো হরফের শব্দ। শব্দগুলো যেন তাদের প্রত্যেকের স্পষ্ট একটা মানে থাকা সত্বেও, ঠিক পূজার জীবনের মতোই। আসলে, শব্দ আর জীবনে মাঝে মাঝে খুব বেশীরকমের জট পড়ে যায়। তখন ধৈর্য্য ধরে বসে বসে সে জট ছাড়ানোর

কাজটা করতে হয় মানুষকে । কিন্তু মুশকিল হল যে মানে বুকে নিয়ে শব্দ আর জীবন জট পাকিয়ে গিয়েছিল, জট ছাড়ানোর পর অনেক সময়ই সে মানে গুলো আর খুঁজে পাওয়া যায়না, নতুন-নতুন মানের জন্ম হয় শব্দ আর জীবনের নতুনভাবে উন্মোচনের পরে । এই কাগজটার শব্দগুলোও ঠিক সেরকমই । এগুলোর জন্য তাদের নতুন মানে নিয়ে পূজাকে আর পূজার জীবনকে এমন একদিকে ঠেলে পাঠাচ্ছে, যেদিকে যাওয়ার কথা ছ'মাস আগে অবধি পূজার দূরতম কল্পনাতেও ছিল না । কিছুদিন আগেও পূজার সামনে জীবন অনেকগুলো রাস্তা পেতে রেখেছিল । অথচ আজ তার সামনে বিকল্প খুব দ্রুত কমে এসেছে । হাতে থাকা সেই সামান্য ক'টা বিকল্প নিয়ে গত একমাসে অনেক নাড়াচাড়া করেছে পূজা । ওলোট-পালোট করে দেখেছে নিজের জীবন আর মন যদি আর কোনও বিকল্প, যদি আর কোনওভাবে বাঁচবার অন্য কোনও হদিশ উঠে আসে, কিন্তু পায়নি । এই একমাসে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নিজেই বারবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে পূজা । এই মন্থনকালে নিজেকে দেখে বিস্মিত হয়েছে সে, দু'হাত দিয়ে হাতড়িয়ে ধরতে চেয়েছে পুরোনো পূজাটাকে পারেনি । এতটাই পাল্টে গিয়েছে তার জীবন যে পুরোনো পূজাটাকে আজ তার অচেনা বলেই মনে হয় । কেমন যেন মনে হয় ওই পুরোনো পূজাটা অন্য কেউ, সে কিছুতেই নয় । আবার কখনও মনে হয়েছে পুরোনো পূজাটাই সে, তার আজকের বাঁচাটা বুঝি বা অন্য কারও থেকে ধার করা এক সাময়িক জীবনযাপন । অনেক বিহলতা, অনেক দোলাচলের পরে অবশেষে সে দেখেছে, পালাতে হবে, বাঁচতে গেলে একটা কোনও কারণ খুঁজে নিয়ে তাকে পালাতে হবে অনেক দূরে । তবে যদি পাওয়া যায় বিকল্প কোনও উপযুক্ত পথ । হাতে ধরা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের টিকিটটার দিকে তাকিয়ে পূজা মনে মনে আরও একবার স্থির করে নিল, সে আমেরিকাই যাবে । অথচ কিছুদিন আগেও নিজের জন্য কোনও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল পূজা । তথাগত চলে যাওয়ার পরের দিনগুলো তার কেটেছিল ঘোরের মধ্যে । খুব জ্বর হলে যেমন সময়কে শুধু বোঝা যায়, কিন্তু ধরা যায়না, ঠিক তেমন করেই কেটে গিয়েছিল পূজার ওইসব দিন । আসলে তথাগত নেই, এই বিরাট পৃথিবীর কোনও কোণেই যে শত হাতড়ালেও তথাগতকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা, এই কথাটা বিশ্বাস হয়েও বিশ্বাস হচ্ছিল না পূজার । সত্যি বলতে কি, পূজার বিশ্বাস করতে ইচ্ছাও করতনা । কেন করবে ? কিভাবে পূজা হঠাৎ একদিন মেনে নেবে যে তথাগত মারা গেছে ? কোথাকার কোন জঙ্গলমহলে পুলিশের বুলেটে তথাগত শেষ হয়ে গেছে ? কই, তার আর তথাগতর মধ্যে তো কোথাও জঙ্গলমহল, বুলেট এসব শব্দগুলোর থাকবার কথা ছিলনা । তাদের মধ্যে তো কিছুটা ঝগড়া, কিছুটা ভাব, খানিকটা অভিমান আর অনেকটা ভালোবাসা থাকবার কথা ছিল । সে'সব নিয়ে তথাগত হঠাৎ হারিয়ে গেছে ? পূজার অবাস্তব লাগত গোটা পরিস্থিতিটা ।

আরও একটা ব্যাপার খুব অবাস্তব আর অসম্ভব মনে হত পূজার । তথাগত জঙ্গলমহলে গিয়েছিল, সেখানে পাকে-চক্রে সে যৌথবাহিনীর মুখোমুখি পড়ে যায়, যৌথবাহিনী ঝোঁকের মাথায় তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল — এ'সব তাও অবাস্তব হয়েও বাস্তব ছিল । কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে তথাগত'র গায়ে সন্ত্রাসবাদী তকমা সেঁটে দেওয়াটা ? না, পূজার এই মতবাদে কোনও মানসিক অসুবিধা বা সংকীর্ণতা ছিল না ।

কিন্তু যে যা নয়, তাকে তাই বলে অভিহিত করা হবে কেন ? শুধু প্রশাসনের দোষ ঢাকবার জন্য ? পূজার ভারী আশ্চর্য লেগেছিল । আরে, বাহিনী তো তথাগতকে চিনতই না, কাজেই তাদের সঙ্গে তথাগতর তো কোনও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের সম্পর্ক ছিলনা যে তারা তথাগতকে ঠান্ডা মাথায় মারবে ।

তারা আসলে একটা ভুল করেছিল । সে ভুলের জন্য পূজাকে কি মাসুল দিতে হচ্ছে, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া ভুল তো ভুলই, সেটা তো স্বীকার করতেই হবে, দোষী ও ভুক্তভোগী দু'জনকেই । অথচ সরকার ভুলটা স্বীকার করতেই চাইল না, যেন ? ভুলস্বীকার করে ফেললেই ছোট হয়ে যাবে । ছোট হয়ে যাবে ? কিন্তু কার কাছে ? জনগণের কাছে, যে জনগণ তাদের ক্ষমতা ভোগ করবার অধিকার দিয়েছে ? তা কর্মী হিসাবে সরকারের কি কর্তব্য নয় তার নিয়োগকর্তার কাছে নিজের ভুল-ত্রুটি মেনে নেওয়া ? আসলে, যে কোনও সরকার স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কর্মচারীর অবস্থান থেকে খুব দ্রুত মালিকের অবস্থানে পৌঁছে যায় । আর প্রকৃত নিয়োগকর্তারা হয়ে ওঠে হাতের পুতুল ।

পূজার রাগ ঠিক এইখানটাতেই হয়েছিল। মাথায় একটা জেদ চেপে বসেছিল ঘটনার মধ্যেকার সত্যিটাকে খুঁজে তুলে ধরবার। সেই তাড়নাতেই সে শিঞ্জিনিদিকে বলেছিল যে সে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করতে চায়। শিঞ্জিনিদি বুঝেছিল তার মানসিক অবস্থা। শিঞ্জিনিদির উদ্যোগে সেদিন সন্ধ্যাতেই প্রেস ক্লাবে আয়োজন করা হয়েছিল এক প্রেস মিটের। পূজা ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় ফুটছিল। মনে মনে স্থিরসংকল্প হয়ে নিচ্ছিল আসন্ন সংগ্রামের জন্য।

কিন্তু সন্ধ্যার ঠিক মুখে তথাগত-র ছবিটার সামনে একলা গিয়ে দাঁড়াতেই সবকিছু যেন গুলিয়ে গিয়েছিল। এতদিনের ভালো চিন্তা এতক্ষণ ধরে জড়ো করা মনের জোর — সব যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। তথাগত হাসছিল ছবিটাতে, যেমন ঝকঝকে হাসি হাসত ও, ঠিক তেমনি। পূজার হঠাৎ মনে হয়েছিল, সে কি শত-সহস্র লড়াই তার চেষ্টাতেও ওই হাসিটা আর কোনওদিন নিজের জীবন ফিরিয়ে আনতে পারবে ? সে তথাগতর গায়ের কালি মুছে দিতে হয়তো পারবে, কিন্তু তার আর তথাগতর মধ্যে রচিত হওয়া ব্যবধানটা ? সেটা সে মুছবে কি করে ? আর তথাগত-র গায়ে কালি লেগেছে বলেই বা সে ধরে নিচ্ছে কেন ? তাতে কি মাওবাদী মানুষগুলোকে কোথাও ছোট করে ফেলছেনা সে ? পূজা মাওবাদ না মানতে পারে, কিন্তু এই বিশ্বাসে ব্রতী হয়ে যে মানুষগুলো জমি-জঙ্গল পাথর আঁকড়ে ধরে লড়াই করে চলেছে, তাদের আদর্শকামী সেই মননকে সে অস্বীকার বা অসম্মান করবে কি ভাবে ?

তাহলে যে তার তথাগতর ও অসম্মান হয়। কারণ কোথাও একটা গিয়ে তথাগত আর ওই মানুষগুলো যে এক। তারা সবাই ওই জঙ্গলমহলে বসবাসকারী হতদরিদ্র আর অসম্মানের জীবন যাপনকারী মুখগুলোর জীবনের ভাষা পাল্টে দিতে চেয়েছিল। সেই চাওয়াটা যে খুব বড়, এতই বড় যে কোন ও পুলিশ কোনও প্রশাসন তার নাগাল পায়না। হতে পারে তথাগত আর মাওবাদীদের সংগ্রামের ফর্মটা আলাদা ছিল, কিন্তু কনটেন্ট ? কনটেন্টের জায়গাটায় তো তারা সবাই একটাই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। পূজা শিঞ্জিনিদিকে ফোন করে বলে দিয়েছিল যে কোনও সাংবাদিক সম্মেলন সে করতে চায়না। বিস্মিত হলেও শিঞ্জিনিদি হয়তো বুঝেছিল ব্যাপারটা, পূজাকে এ' নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করেনি সে।

কিন্তু সে লড়াই অনর্থক বুঝে থামিয়ে দিলেও, আরেক লড়াইয়ের হাত থেকে মুক্তি পায়নি পূজা। সে লড়াই তাকে প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ছিল। সে লড়াই জীবনে বেঁচে থাকবার জন্য একটা মানে খোঁজবার লড়াই। সেই মানে খোঁজার জন্যই অ্যামেরিকা চলে যাচ্ছে পূজা আরও পড়াশুনা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। পূজা জানেনা, ওখানে গিয়েও যে মানে সে খুঁজছে দিনরাত, তা পাবে কিনা। না, সত্যিই পূজা জানেনা। জানবার প্রয়োজনও নেই তার, কারণ পূজা এইটুকু অন্ততঃ জানে যে এ'দেশে, এ'শহরে তার জন্য কোনও মানে পড়ে নেই। এখানে তার জীবন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীনতায় ভরপুর। তাই পূজা চলেছে অন্য দেশে, অন্য হাওয়ায় আর জলে, যদি কোনও দিন আবার কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, যদি কোনওদিন আবার নিজেকে বলতে ইচ্ছা করে, ''আমি ভালো আছি'', যদি কোনওদিন . . . যদি কোনও দিন . . . যদি কোনও দিন . . .

প্রশস্ত নদীতে হু হু করে বয়ে চলেছে একটা নৌকা। একটু আগে জোয়ার এসেছে নদীর বুকে। নদী এখন যেন বুক উপচোনো পূর্ণ যৌবনা এক নারী। নৌকাটা এখন দ্রুত ছুটে চলেছে যেন আশ-পাশের তীরের দিকে ফিরে তাকানোর সময় নেই তার। যেন এক্ষুণি তাকে পৌঁছতে হবে মোহনায়, যেন খুব বড় মাপের এক সিদ্ধিলাভ হবে মোহনাকে ছুঁলে।

ঈশাণ কোণে আজ দুপুর থেকেই জট পাকিয়ে আছে কিছু মেঘ। স্থির দৃষ্টিতে এতক্ষণ যেন দেখছিল তারা নৌকাটাকে। হঠাৎ নড়ে উঠল মেঘের দল, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে জিভ দিয়ে নখগুলোকে চেটে নিল তারা আর তারপর বীর বিক্রমে রওনা দিল মাঝ নদীতে, নৌকাটির যাত্রাপথের ঠিক ওপরে।

দেখতে দেখতে থেমে গেল যাবতীয় হাওয়া, এতক্ষণ ঝকঝক করতে থাকা আকাশ যেন নিমেষে ভয় পেয়ে হয়ে গেল ধূসর, উজ্জ্বল্যহীন। চারিদিক থমথম করতে লাগল কি যেন এক অজানা আশংকায়। আপন মনে ছুটতে থাকা নৌকা চোখ তুলে দেখবার আগেই সেই মেঘেরা ঝড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর বুকে। ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই শুরু হয়ে গেল ভয়ানক ওলট পালট। নদী ভয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। অত বড় নৌকাটা মোচার খোলার মত ভাগ্যের হাতে দুলতে

লাগল । নৌকার মনে হতে লাগল, এবার প্রচন্ড চাপে যেন হৃদপিন্ড চৌচির হয়ে যাবে । অবশেষে, নিজেদের উন্মত্ত খেলা শেষ করে যত তাড়াতাড়ি এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তত তাড়াতাড়ি যেন হারিয়ে গেল মেঘেরা । এতক্ষণের টালমাটাল সহ্য করে জিভ বের করে হাঁফাতে লাগল বিশাল নদী । আর সেই নদীর মাঝখানে ভাঙাগড়ার অভিজ্ঞতা হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল নৌকা । ঝড় চলে গেছে, প্রকৃতি এখন শান্ত, দুদিকের তীরের গাছ, বাড়িরাও আবার গুছিয়ে তুলেছে নিজেদের । আমন্ত্রণ চিঠি মূলক হালকা একটা হাওয়া বয়ে আসছে মোহনার দিক থেকে । কি করবে ও নৌকা ? আবার ভেসে যাবে মোহনার দিকে ? নাকি গিয়ে দাঁড়াবে কোনও এক তীরে ? কোথাওই কি কিছু প্রমাণ করবার আছে তার ? কিছু পাওয়ার আছে ? না কি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে অথবা থেমে গেলেই হল ? সে কি কেবলই স্রোতের নাকি তীরেরও ? নাকি সে আদতে কারও নয়, শুধু নিজের ? মাঝনদীতে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ভাবতেই লাগল নৌকাটা ।

হঠাৎ তন্দ্রাটা কেটে যেতে প্রথমটা খুব আচ্ছন্নবোধ হল নীলের । যেন একটা ঘোর কাটতে গিয়েও কাটছেনা । মাথার মধ্যেকার ধোঁয়াগুলো পরিস্কার হয়ে যেতে আস্তে আস্তে খাটের ওপর উঠে বসল নীল । উফ্ জোর ঘুমিয়ে পড়েছিল সে । ঘড়িতে এখন দুপুর সাড়ে তিনটে, এখন মনে পড়ছে, পাপান খেয়ে দেয়ে কোচিংয়ে পড়তে চলে গেল দেড়টা নাগাদ, আর তারপরই রবিবারের এই একলা দুপুরটা নিয়ে ঠিক কি করবে বুঝতে না পেরে একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল নীল আর তারপরই এই নৌকার স্বপ্ন ।

জানলার বাইরের এক চিলতে প্রকৃতিটা খুব প্রখর হয়ে আছে এই মুহূর্তে । নীল ধীর পায়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো । নিচের রাস্তাটার দিকে তাকাতে ইচ্ছা হল না তেমন, নীল খোলা রোদভরা আকাশটা দেখতে চাইল । আচ্ছা, সাড়ে তিনটের এই সময়টা দুপুর না বিকেল ? নাকি দুপুর বিকেলের সীমানায় থমকে দাঁড়ানো নিছক একটা মুহূর্ত শুধু যেখানে দাঁড়িয়ে দিনের রিলে রেসের ব্যাটন বদল করে খন্ড সময়েরা ? বলা শক্ত । আসলে, সারা দিনের মধ্যে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যাকে নির্দিষ্ট কোনও নাম দিয়ে ওঠা মুশকিল । তারা এদিকের ও হতে পারে, ওদিকেরও । অথবা তারা ওই নৌকার মতই কারও না হয়ে উঠে আসলে চরম দ্বিধাগ্রস্থতায় একান্তই নিজস্ব, ঠিক যেমন এই মুহূর্তে নীলের জীবনটা । নীলের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল । ঘর আবহাওয়াটার দিকে তাকিয়ে থাকতে এখন বেশ কষ্ট হচ্ছে তার যেন । নীল ধীরে ধীরে বসবার ঘরে ঢুকে এল । ভারী পর্দা টানা থাকায় এ'ঘরটায় বেশ ঠান্ডা একটা ভাব আছে । পর্দাগুলোয় সাদা আর নীলের ফ্লোরাল মোটিফ করা, দেখলে মনটা শান্ত হয়ে আসে । এমন হালকা অথচ দর্শনীয় চাদর, পর্দা কিনতে জয়িতা খুব ভালোবাসত । এই পর্দাটাও জয়িতার কেনা । নীল স্পষ্ট মনে করতে পারছে, স্কিপার থেকে । জয়িতাটা কেটা-কাটা করতে খুব ভালোবাসত । কেনা-কাটায় ওর রেঞ্জটা ছিল খুব বিস্তৃত, হাতিবাগানের ফুটপাত থেকে সাউথ সিটি, যেখানেই কোনও জিনিস দেখে ওর ভালো লাগত, কিন্ত ।

হয়তো সবগুলো ব্যবহারই করে উঠতে পারেনি শেষ পর্যন্ত মেয়েটা । বড় সরল ছিল জয়িতা, নীলের কাছে আবদার করত শিশুর স্বাচ্ছন্দ্যে, নীল হ্যাঁ বললে মহাখুশী, না বললেই বাচ্ছাদের মতো অভিমান । আবার সে অভিমান যে অনেকক্ষণ টিকে থাকতে পারত, তা ও নয়, একটু পরেই ভুলে যেত । নীলের সবচেয়ে মজা লাগত যখন খাবার নিয়ে জয়িতা আর পাপানের লাগত । অনেক সময়ই হত, নীল হয়তো অফিস থেকে ফেরবার সময় চারটে ফিসফ্রাই নিয়ে এসেছে, এবার পাপান করত কি নীল আর জয়িতাকে একটা করে দিয়ে নিজে বাকি দুটোর দখল নিত । এখন ফিস ফ্রাই যেহেতু পাপান আর জয়িতার দু'জনেরই খুব প্রিয়, অতএব জয়িতা মেয়ের কাছে আবদার জুড়ত, ''পাপান, দে না রে একটা থেকে ভেঙে একটু, পাপান না বলতেই আবার শুরু করত জয়িতা, ''তুই তো দুটো নিয়েছিস বাবা, অত স্বার্থপর কেন রে তুই ? আমি তো তোকে সব খাবারের ভাগ দিই, এরপর আসিস মা তোমার থেকে আরেকটু চাওমিন দাও বলতে, কিছু দেবনা''। পাপান মা'র ছেলেমানুষিতে হেসে ফেলত, আর তারপর যেই একটু ফিসফ্রাই ভেঙে এগিয়ে দিত, জয়িতা মহাখুশী, তখন আবার, ''এতটা দিলি কেন, একটু দে, একটু'' বলতে বলতে পাপানকে একটু ফ্রিসফ্রাই ফেরত ও দিয়ে দিত । ভারী ছেলেমানুষ ছিল মেয়েটা । আর নীল ইচ্ছা করেই ওর ছেলেমানুষীটাকে জিইয়ে রাখত, প্রশয় দিত । আসলে নীলের ভীষণ একটা কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল জয়িতার প্রতি । পারিবারিক শান্তির প্রতি চিরকালই নীলের ছিল অদম্য স্পৃহা । সেটা জয়িতা নীলকে

দিয়েছিল, শুধু দেয়নি ভরপুর দিয়েছিল। নীলের অসাধারণ লাগত সেটা। এই যে সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে সোমদত্ত সেন থেকে নীল হয়ে যাওয়ার প্রসেসটা, তাতে যে কোন বাধা পড়তনা, এই যে নীল বাড়ি ফেরার সময় জানত যে বাড়িতে তারজন্য শান্তি আর যত্ন অপেক্ষা করে আছে, এটার দাম নীলের কাছে এতই বেশী ছিল যে নীল জয়িতাকে একটু প্যাম্পারই করত বলা যায়। আরও একটা কারণ ছিল, নীল ভাবতে ভাবতে সোফায় গা এলিয়ে পা দুটো সামনের নিচু টেবিলে তুলে দিল। জয়িতার প্রতি তার মনে অসম্ভব একটা মায়া কাজ করত। নীল খুব ভালো করে জানত, সে ছাড়া জয়িতার দ্বিতীয় কোনও আশ্রয় নেই। সে বিন্দুমাত্র সরে ফেলে জয়িতা পুরোপুরি নড়ে যাবে। হুরমুড়িয়ে ভেঙে পড়বে মেয়েটার জীবন। জয়িতা ছিল পরজীবি লতানে। জীবনে কাউকে না কাউকে জড়িয়ে ধরে নিজস্ব কল্পসুখের রাজত্বে বসবাস করতে ভালবাসত জয়িতা। সে কল্পরাজ্যে কেবল সুখ, কেবল প্রাপ্তি, শান্তি আর নিত্যনতুন কল্পনা ও স্পৃহা, সামান্যতম অসুখেও থরথর করে কেঁপে ওঠে সে রাজ্য। তাই নীল চেষ্টা করত অসুখ গুলোকে জয়িতার পৃথিবীতে না ঢুকতে দিতে। অসুখ গুলোকে সে-ই সামলে নিত পরম মমতায় আর ভাবত হঠাৎ যদি কোনও কারণে সে হারিয়ে যায়, কেমন হবে জয়িতার জীবন ? অথচ দ্যাখো, সে' সব সমস্যার সমাধান কেমন সহজে ঘটিয়ে ফেলল সহজ ভাবে ভাবতে পারা মেয়েটা। নিজেই চলে গেল। আর নীলকে দাঁড় করিয়ে গেল জীবনের এমন এক মোড়ে যে মোড় থেকে শুরু হওয়া প্রতিটি রাস্তার শুরুতেই একটা করে প্রশ্নচিহ্ন। এই প্রশ্নচিহ্ন গুলোর পিছনে তার জন্য কি আছে, নীল জানে না। সে জানেনা, কোন পথটায় হেঁটে গেলে সে ভালো থাকবে, সুন্দর কে ছোঁবে, কি তার নিয়তি ? যে কোনও একটা পথে অখন্ড হেঁটে যাওয়া নাকি নিজেকে খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পথের ঢালে গড়িয়ে দেওয়া ? আসলে, উদ্দেশ্য, জীবনে একটা স্থির উদ্দেশ্য চাই। গড়পড়তা দৈনিক যে'সব উদ্দেশ্য, তার বাইরের এক অন্যরকম উদ্দেশ্য। একমাত্র সেই উদ্দেশ্যই নিরুপণ করে দেবে নীলের ভবিতব্য। আজ সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শিঞ্জিনিকে সাউথ সিটি ফুড কোর্টে আসতে বলেছে নীল। শিঞ্জিনির সঙ্গে তার কথা আছে, নিজেকে নিয়ে অনেক অনেক আলোচনা করবার আছে তার।

ভিতরে ভিতরে চরম এক অস্থিরতা চলছে, নীল বুঝতে পারছে।

রোজ সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাত্রে শুতে যাওয়া অবধি সেই অস্থিরতার জিয়নকাল। কি যেন একটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে নীলকে, সেটা যে ঠিক কি, নীল নিজেও বুঝে উঠতে পারেনা। ভয় ? কিন্তু কিসের ? নিরাপত্তাহীনতা ? কিন্তু কিসের থেকে ? নীল যেন একটা কিছু ভাঙতে চাইছে আবার একটা কিছু গড়তে, কিন্তু মনের জোর এতটাই দুর্বল যে ভাঙা বা গড়া — কোনও কাজটাই করে উঠতে পারছে না। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, নীলের মনে হচ্ছে যে সে ভালো নেই, অথচ কি হলে যে সে ভালো থাকবে, তাও সে জানেনা। ভালো মন্দর সব হিসাবগুলো যেন গুলিয়ে গেছে অ্যাকাউন্টেন্ট নীলের জীবনে।

এত ধোঁয়াশার মধ্যেও একটা কথা অন্ততঃ নীলের কাছে খুব পরিস্কার। সোমদত্ত সেন কে আর সে সহ্য করতে পারছে না। সহ্য করতে পারছে না বললে কম বলা হল, সোমদত্তর সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত স্পর্শকাতরতায় ভুগছে সে। তার মনে, তার আচরণে, দৈনন্দিন জীবনে যে মুহূর্তে সোমদত্ত সেন বিন্দুমাত্র মাথা তোলে, নীল যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে। তার সারা দেহ কি এক আশংকায় সিরসিরিয়ে ওঠে। তখন নীলের সব ফেলে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, এমন কি কখনও কখনও জীবন থেকেও। অফিসে আজকাল গিয়ে চেয়ারে যে বসে, সে কোনও মতেই আর সোমদত্ত সেন হয়ে উঠতে পারেনা। সে আসলে নীল-ই শুধু সোমদত্ত'র মুখোশটা পরা। আগে কাজের উপর যে নিয়ন্ত্রণ সে অপিসে নিতে পারত, এখন তাকে জোর করে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তা নিতে হয়। আশপাশের মানুষেরা হয়তো তা বুঝতে পারেনা, বুঝলেও সদ্য পত্নীহারার স্বাভাবিক বিচলন বলে ধরে নেয়, কিন্তু নীল জানে, সে আর একটুও সোমদত্ত সেন নেই, বরং সোমদত্ত তার কাছে এখন অতৃপ্ত এক প্রেতাত্মার মতোই ভয়াবহ।

আসলে, অফিস বলে নয়, সব জায়গাতেই নীল পালাচ্ছে এখন নিজের থেকে। পাপানের এখন তার ভরসার সবিশেষ প্রয়োজন, নীল বোঝে। আগে হলে নীল সেই চিন্তাতেই যেন ডুবে থাকত। এখন যেন আর তা নয়। নীল পাপানের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটায়, চেষ্টা করে যাতে মেয়েটা কোনও ফাঁক অনুভব না করে, কিন্তু একই সঙ্গে নীল বোঝে যে আসল ফাঁকটা তার চেষ্টাতেই রয়ে যাচ্ছে। সে সবই করছে বটে, কিন্তু সেই করাটা যেন আরোপিত, যেন পরোনো তীব্র অনুভূতির

একটা আফটার-এফেক্ট মাত্র, আসলে সে পাপানের থেকেও পালাতে চাইছে। এই যে পাপান আজ পড়তে গেছে সেখান থেকে তার দিদার বাড়ি যাবে, সেই রাত্রে ফিরবে, আগে হলে নীলের ভীষণ মন কেমন করত পাপানের জন্য, এখন যেন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, মনে হয়, যাক, এখন কিছুক্ষণ অন্ততঃ পাপানকে সামলাতে হবে না, ওর মুখোমুখি হতে হবেনা।

কোনও কিছুর মুখোমুখি হতেই আর ভালো লাগছেনা নীলের, এমনকি নিজের অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসেরও নয়। নীল রোজ সকালে উঠে কিছুটা করে লেখে। তার ভালো লাগে সকালটা এ'ভাবে শুরু করতে। একটু ভুল বলা হল, আসলে তার ভালো লাগত বলা ভালো। আগে সে লেখার উৎসাহে চট করে উঠে পড়ত বিছানা থেকে। এখন ঘুম ভেঙে গেলে উঠতে ইচ্ছা করে না তার। শুয়ে শুয়ে দশবার ভাবে, আজ আর উঠে লিখবে কি না। কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে। মনে হয় যেন কিছুই লিখে উঠতে পারবে না। মনে হয় এতদিন ধরে যা লিখেছে, সব বাজে, যা লিখবে তা আরও বাজে আর অর্থহীন।

তবু একটা আশ্চর্য কথা নীল লক্ষ্য করেছে। একবার জোর করে লিখতে বসে গেলে তখন নীল নিজেকে সবকিছুর থেকে আলাদা করে ফেলতে পারে। ভয়, আশংকা, নিস্পৃহতা, পলায়নী মনোবৃত্তি গুলো তখন যেন উধাও হয়ে যায়। নীল সেই সময়টুকুর জন্য নিজেকে যেন ফিরে পায়। নীল ভালো হয়ে যায়। তখন মনে হয় যেন শুধু লিখে গেলেই সে ভালো থাকবে, অন্য কিছুতে নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে লেখা থামিয়ে দিতে হয় তাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অদ্ভুত বিষাদ এসে গ্রাস করে তাকে। নীল দম আটকে ছটফটানি শুরু করে আবার।

ঘড়ির দিকে তাকাতে নীল সচকিত হয়ে উঠল। পাঁচটা শিঞ্জিনির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আছে আজ। অনেক কথা, অনেক বিচলন উজাড় করবার আছে তার শ্রী'র কাছে। নীল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

উদ্ভাসিত আলোটার নিচে নীলকে এই মুহূর্তে খুব উজ্জ্বল দেখতে লাগছে। অনেকগুলো কথা বলে নীল এইমাত্র থামল। কথাগুলো যখন বলতে আরম্ভ করেছিল, নীলকে খুব দ্বিধাগ্রস্থ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, যেন একরাশ, দিশাহীনতায় ডুবে রয়েছে। অথচ যখন শেষ করল, তখন বড় দীপ্ত ভঙ্গিতে। যেন কথাগুলোর সঙ্গে পথ চলতে চলতে হারানো আত্মবিশ্বাস কুড়িয়ে পেয়েছে নীল।

বরিবারের সন্ধ্যায় গমগম করছে ফুডকোর্টটা। বেশীর ভাগই তাদের অর্ধেক বয়সী ছেলে-মেয়ে সব। আগে একটা পাড়া-সংস্কৃতি ছিল এই শহরে। তখন বিকেল হলে কমবয়সী ছেলের দল আড্ডা মারবার জন্য ভীড় জমাত পাড়ার এক চিলতে খেলার মাঠে কিংবা রকে। আর চা খেতে খেতে আড্ডাটা, মারতে হলে পাড়ার অমুকদার চায়ের দোকানে। সেখানেই এক ভাঁড় বা হাতলভাঙা কাপের চায়েই ঘনিয়ে উঠত যাবতীয় আড্ডা। আর মেয়েরা ? না কমবয়সী মেয়েদের আড্ডা খবর রাখা বড় মুশকিল ছিল। ক্লাস সেভেন এইট হয়ে গেলেই বান্ধবীদের সঙ্গে বাইরে গিয়ে খেলাধূলা বন্ধ। ছেলেরা বুড়ো বয়স অবধি মাঝে ফুটবল ক্রিকেট খেলতে পারত, মেয়েরা আর নয়। বাড়ির ছাদে মা কাকিমা, বৌদিদের সঙ্গে আর মাঝে মাঝে প্রাণের বান্ধবীদের বাড়ি — এই ছিল তাদের আড্ডার পরিধি। এখনকার ছেলে-মেয়েরা সেইসব সীমারেখা একদম মুছে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন কি অনায়াসেই একটি মেয়ে একটি ছেলের কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে পারে। শিঞ্জিনির বেশ ভালোই লাগে এদের মন খুলে মেশামেশির ধরণ টা। তারা তো এমন ভাবতেই পারত না। ভাবতে পারলে অনেক জীবনের গতিই পাল্টে যেতে পারত। বদলে যেতে পারত অনেক সমীকরণ। যে সেখানে আজ দাঁড়িয়ে আছে অথবা যার যেখানে দাঁড়াবার কথা ছিল, তার অনেকটাই অন্যরকম হয়ে যেতে পারত, অনেকটাই। হাতের উপর অন্য একটা হাতের স্পর্শ পেতে শিঞ্জিনি চিন্তার সুতো গুটিয়ে সামনের দিকে তাকাল।

- ''শ্রী, কিছু বলবেনা ?'', নীল আলতো স্বরে প্রশ্নটা করল। একটু চুপ করে থেকে আবার জিজ্ঞাসা করল, ''শ্রী, আমি কি ভুল ভেবেছি ?''

নীলের মুখটা এখন একদম একটা বাচ্চা ছেলের উৎকণ্ঠায় ভরে গেছে। যেন শিঞ্জিনির ঠিক ভুল বলবার উপরেই নির্ভর করে আছে তার সিদ্ধান্তটা। শিঞ্জিনির হঠাৎ ভারী অবাক লাগল। নীল তো আর কেউ নয়। নীলের কোনও সামাজিক

পরিচয় তো নেই তার জীবনে। সত্যি ভাবতে গেলে, তার আর নীলের জীবনের দুটো সম্পূর্ণ আলাদা কক্ষপথে পাক খেয়ে মরবার কথা। অথচ আলাদা থাকতে-থাকতেও কিভাবে যেন দুটো কক্ষপথ কোন এক ছায়াপথে এসে মিলে মিশে গেছে। সে ছায়াপথ নামহীন, সে ছায়াপথ সবার দৃষ্টিপথের অগোচরে সৃষ্ট। দু-এক জন সে ছায়াপথ দেখেছে তারা দেখেছেই কেবল, না বুঝতে পেরেছে সে ছায়াপথের সৃষ্টির রহস্য, না জানে তার ধ্বংসের চাবিকাঠির ঠিকানা। শুধু নীল আর সে বুঝছে, নতুন তৈরী হওয়া এ' ছায়াপথ ক্রমশঃ অমোঘ হয়ে উঠেছে তাদের জীবনে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে স্বতঃসিদ্ধ রূপে।

শিঞ্জিনি নীলের দিকে তাকিয়ে পুরোটা হাসল। তারপর সরাসরি উত্তরটা দিল, ''তুমি একদম ঠিক ভেবেছ নীল।''

# # #

নীল টেবিলের ভীড়গুলোকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণের দেওয়ালের মস্ত কাঁচটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। শহরটা অনেকটা দূর অবধি দেখা যায় এখান থেকে। শহরের এইদিকটায় শহরতলি এমন কি গ্রামাঞ্চল গুলো ও ধীরে ধীরে শহরের অংশ হয়ে গেছে বাইপাসগুলো হয়ে যাওয়ার পর থেকে। আসলে, নতুন পথের সন্ধান পেলে জীবন নিজের থেকেই কিভাবে যেন বড় হয়ে ওঠে, বৃহৎ কিছুর অংশ হয়ে ওঠে। তখন তাকে আর জোর করে চেষ্টা করে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়না, সেই নতুন পথই তাকে সাদরে ডেকে নেয় জগতের আনন্দযজ্ঞে, একটি সাধারণ জীবন তখন অনায়াসেই সাধারণ থেকে অন্য, অন্য থেকে অন্যতর হয়ে ওঠে।

নীলের ভীষণ হালকা লাগছে এখন। যে দ্বিধাগ্রস্থতা তাকে গত কয়েকদিন ধরে কুরে কুরে খাচ্ছিল, তার হাত থেকে এখন নীলের মুক্তি। আর কোনও দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ চিন্তার অবকাশ নেই নীলের জীবনে, নীল চাকরিটা ছেড়ে দেবে। কয়েকদিন ধরেই সকালে ঘুম থেকে উঠে নীলের চাকরিটা করতে যেতে আর ভালো লাগছিলোনা। এমন কি নিজের জীবনটাও না। আসলে, মানুষের দৈনন্দিন জীবননির্বাহের ভরকেন্দ্র হিসাবে তো একটা মূল ঘটনা থাকে, যাকে ঘিরে আবর্তিত হয় অন্য ঘটনারা। গত কয়েক বছর ধরে নীলের জীবনে সে ভরকেন্দ্র হয়ে উঠছিল তার চাকরি। তার বাকি জীবনটা ওই চাকরিটা ঘিরেই পাক খেতে থাকছিল। চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি হতে হতে ব্যাপারটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন ওই চাকরিটাই নীলের জীবন, ওই চাকরিটার জন্যই নীল, ওই চাকরিটাই নীল। ক্লান্ত লাগত, ভীষণ ক্লান্ত লাগত মাঝে মাঝে, অথচ অদ্ভুত একটা ঘোর ছুটিয়ে নিয়ে বেরাত নীলের ঘাড়ে চেপে বসা সোমদত্ত সেনকে। শুধু মাঝে মাঝে যখন কোনও ভোরে অথবা মাঝরাতে সোমদত্তকে সাময়িক ঘুম পাড়িয়ে জেগে উঠত নীল, কবিতা লিখত, একটু অন্যরকম ভাবনাগুলোকে নিয়ে নাড়াচাড়া করত, তখন সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে যেত নীল নিজেই মনে হত, আরে, তাহলে শুধু চাকরি করতেই নয়, এমন ভাবেও সে তাহলে বেঁচে আছে? তবু এই অন্যরকম বাঁচাটাকে একদম প্রশ্রয় দিতে চায়নি সে, বিলাসিতা বলে মনে করেছে। তারপর একদিন যখন সে উপন্যাসটা লিখতে শুরু করল, তখনও এই অন্যরকম বাঁচাটা সব বাধা ঠেলে মাথাটা খুব উঁচু করে দাঁড়াতে চাইল। প্রথমটায় সে তেমন কিছু টের পাওয়া গিয়েছিল, তা নয়, কিন্তু যতদিন যেতে লাগল, ওই উপন্যাস তার সমস্ত শব্দ আর চরিত্রগুলো কে নিয়ে নীলের মনের চারিদিকে এক আশ্চর্য অবরোধের সৃষ্টি করল। নীলের জীবন নীলের কাছেই প্রশ্ন করতে শুরু করল, অন্য রঙ অন্য ভাষার দাবী জানাতে থাকল ক্রমাগত জয়িতা চলে যাওয়ার পর যা বেড়ে গেছে সহস্রগুণ। এখন নীলের মনে হয় যে এই লেখালেখি, এই অন্য বাঁচাটা আর বিলাসিতা নয়, বরং নিজের বোধ ও চেতনার নতুন উন্মেষকে দূরে সরিয়ে রেখে গতানুগতিক গা ভাসানোটাই একটা বিলাসিতা, যে বিলাসিতা নীল আর দেখাতে পারে না, দেখালে তা অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে। জীবনের অর্ধেক বয়ে গেছে মজা নদীতে, বাকি অর্ধেকটাকে নীল কোনও এক স্রোতস্বিনী নদীতে ভাসিয়ে সমুদ্রে মেশাতে চায়। আর চেপে-চুপে রাখা নয়, একদম নির্বাসন পাঠিয়ে দিতে চায় সোমদত্ত সেনকে, নীল সেনকে যথাযোগ্য মর্যাদায় তার ন্যায্য সিংহাসন ফিরিয়ে দিতে চায়। যে উথাল-পাথাল, ভাঙা-চোরা সম্প্রতি হয়ে গেছে তার জীবনে, সে ধ্বংসে দাঁড়িয়ে কোমর বেঁধে যদি নতুন করে কিছু গড়তেই হয়, তবে তা নীলের জন্যই গড়বে নীল সোমদত্তের জন্য আর নয়।

পিঠে হাতের স্পর্শ পেয়ে নীল ঘুরে দাঁড়ালো। শিঞ্জিনি টেবিল ছেড়ে উঠে এসেছে, ''নীল, এতদিন ঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পেরেছো। এতদিন খাল-বিলে আটকে ছিলে এবার সমুদ্রের হও নীল। নীল, তুমি যে কারও একলার নও, এমনকি নিজেরও

নও, তুমি যে সবার, এই গোটা পৃথিবীর। নিজেকে ছড়িয়ে দাও নীল, তোমার মধ্যেকার যে বোধ, যে চেতনা আর সবকিছুকে অন্য এক দৃষ্টিতে দেখবার অদ্ভুত ক্ষমতা, তার থেকে অন্যদের বঞ্চিত করে রেখোনা। তোমার চিন্তা তোমার সৃষ্টি, তোমার ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে উজাড় করে দাও নিজেকে, ক্ষইয়ে দাও। এ' এক আশ্চর্য ক্ষয়ে যাওয়া নীল, এ ক্ষয় যত হবে, ততই বাড়বে সৃষ্টি, ততই জাগবে নতুন সব সম্ভবনারা। প্রকৃতি তোমার মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা প্রোথিত করে দিয়েছে, তাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করো নীল, এ' তোমার দায়িত্ব।''

নীল শিঞ্জিনির চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওপরের ঠোঁটটা, দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে সজোরে চেপে আছে নীল, যেন আবেগ আর মন দুই-ই সংহত করবার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। শিঞ্জিনি আবার কথা বলতে শুরু করল, ''তুমি শুধু লিখে যাও নীল, নিজেকে মেলতে থাকো। অন্য কিছু নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। পাপান, তোমার সংসারের অনায়াস চলা সব, স-অ-ব দেখে নেব আমি। জয়িতা যা সাজিয়ে রেখে গেছে আমি তার সব সামলে রাখব। তুমি কিছু চিন্তা করোনা''। একটু চুপ করে থেকে শিঞ্জিনি শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করে, ''নীল, তোমার জীবন ও জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত কিছুর দায়িত্ব আমি আজ থেকে নিলাম। এবং তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি এ' দায়িত্ব আমি ততদিন অবধি পালন করে যাবো, যতদিন না তোমার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তুমি কেবল আমার দেখা স্বপ্নটাকে সফল করো নীল, আমাকে আমার স্বপ্নটাকে সত্যি করে দাও''।

নীল শিঞ্জিনির কাঁধে হাত রাখে। চোখ দুটোকে কুঁচকে দেখতে থাকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা নারীটিকে, যেন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে অচেনা কাউকে উত্তর খুঁজছে কোনও বিরাট প্রশ্নের।

— ''কিন্তু শ্রী, তোমার নিজের সংসার ?''

সামনের একটা টেবিল ফাঁকা হয়ে গেছে। শিঞ্জিনি মৃদু হেসে একটা চেয়ারে বসে পড়ে, তারপর নীলের হাত ধরে অন্য একটা চেয়ারে বসায়, ''নীল, মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন জীবনের ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য আর বৃহৎ উদ্দেশ্য পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায়। মানুষকে তখন স্থির চিত্তে বেছে নিতে হয় যে কোনও একটা উদ্দেশ্যকে। এমন নয় যে অন্য উদ্দেশ্যটিকে সে ত্যাগ করে। অন্য উদ্দেশ্যটিও তার নিজস্ব মূল্য নিয়ে থেকে যায় সে মানুষের জীবনে, তবু যে উদ্দেশ্যটিকে আঁকড়ে ধরবার, যে উদ্দেশ্যটিকে সস্নেহে লালন করবার, তাকেই আঁকড়ে ধরতে হয় নীল, মানুষকে তাকেই লালন করতে হয়। এটাই নিয়ম। পৃথিবীতে কোনও নতুন সৃষ্টির জন্য একজন স্রষ্টার প্রয়োজন থাকে এ'কথা যেমন সত্যি ঠিক তেমনই সৃষ্টির জন্য শুধু স্রষ্টাই যথেষ্ঠ নয়, অন্য মানুষেরও প্রয়োজন থাকে নীল, যে স্রষ্টার সৃষ্টির পথ সুগম করবে। আমাকে সে ভূমিকা যে পালন করতেই হবে নীল, না'হলে আমি জানি, তোমার সৃষ্টির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে''।

নীল অবাক হয়ে গেল। শ্রী তার জন্য . . . মানুষ মানুষের জন্য এতটা করতে পারে ? এ'ভাবে জীবনের সব ঝুঁকি মাথায় নিয়ে নির্ভিক হতে পারে ? কিন্তু শ্রী'র সংসার ? ওর পরিবারের মানুষেরা ? তারা তা মানবে কেন ? নীলের সাধনায় আত্মত্যাগের কোনও দায় তো তাদের নেই। তারা যদি বিরুদ্ধতা করে ? যদি বলে ওঠে, এ' আমরা মানিনা ?

— ''শ্রী, কিন্তু তোমার পরিবারের মানুষেরা ? তারা তোমার আমার নিয়ম মানবেন কেন ? তারা যদি তোমার এ' সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন ? বিরুদ্ধতা করেন ? বলেন তাদের সংসার থেকে এ'সব চলবেনা ''। নীল শিঞ্জিনির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক প্রশ্নগুলো করে।

শিঞ্জিনি একটু চুপ করে থাকে, তারপর দৃঢ় প্রত্যয়ে উত্তরটা দেয়, ''তবে সে সংসার আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে নীল, তখন সে সংসার আমি ত্যাগ করতে বাধ্য হব।''

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

স্বপ্না মিত্র

পাহাড় চুড়ো

পর্ব ১

"অ্যাই অ্যাই, ওদিকে নয়, এদিকে। লাইন দিয়ে দাঁড়াও সবাই। অ্যান্ড নো মোর টক, চুপ, একেবারে চুপ, ঠোঁটে আঙ্গুল।", বেঁটে প্যাকাটি মার্কা ছেলেটা বলল আদেশের ভঙ্গীতে।

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছেলেদের হোস্টেল। ফ্রেশারদের নিয়ে সিনিয়র ছাত্ররা মজা করছে, মানে দাদাগিরি দেখাচ্ছে, অর্থাৎ র‍্যাগিং চলছে।

বেঁটে ছেলেটার পাশে আর একটা ছেলে, মাঝারি উচ্চতার, ঘাড় অবধি চুল, অনবরত সিগারেট ফুঁকছে, আজকের দাদাগিরির মিশনে সেই লিডার।

লিডার মত ছেলেটা হাতের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অবধি দৌড়ে যা, এক পায়ে।"

এক পায়ে দৌড় শেষ হলে সিনিয়র ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে কীসব গুজগুজ ফুসফুস শুরু করলো, একটা হাসির রোল উঠলো সিনিয়রদের মধ্যে।

আবার সেই বেঁটে প্যাকাটি মার্কা ছেলেটা এগিয়ে এলো, "অ্যাই অ্যাই, প্যান্ট খোল সবাই।"

কী আশ্চর্য, সকাল এগারোটার সময় ক্যাটক্যাটে দিনের আলোতে সর্বসমক্ষে এক দঙ্গল ধেড়ে ছেলে দল বেঁধে প্যান্ট খুলবে কেন ? এরকম অদ্ভুত প্রস্তাবে নতুন ছেলেগুলো যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পরস্পরের মধ্যে।

লিডার ছেলেটা খেঁকিয়ে ওঠে, "প্যান্ট খুলতে বলেছি তোদের। উলঙ্গ হতে বলিনি।"

ফ্রেশারদের মধ্যে যে ছেলেটার মাথায় চুপচুপে তেল, শারীরিক ভাষায় শহুরে ভাবের অভাব, সেই সবার আগে সবার সামনে প্যান্ট খুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। তার পুরনো বাদামী রঙের প্যান্টের নীচে ছিল লাল টুকটুকে ভি-কাটের ট্রাঙ্ক, একেবারে নতুন।

এই ছেলেটাকে দেখে বোধহয় বাকি ছেলেদেরও সাহস হল, তারাও সতীর্থের অনুগামী হতেই টেপ রেকর্ডার অন করে দিল বেঁটে ছেলেটা, বেজে উঠলো, "ব্যাবিলন ব্যাবিলন ..."

লিডার ছেলেটা মিচমিচ করে হাসল, "শুধু গান শুনলে চলবে ? ড্যান্স, বেবি ড্যান্স !"

ব্যস, ছেলেদের হোস্টেলের বারান্দায় লাল নীল সবুজ জাঙ্গিয়া পরা এক দল তরুণ একেবেকে শুরু করে দিল মিউজিকের তালে তালে নাচ।

সিনিয়রদের মধ্যে একজনের চেহারা বেশ চোখে পড়ার মত, আকারে লম্বা-চওড়া, টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, ভাসা ভাসা চোখ। সে হাত তুলে বলল, "অনেক হয়েছে, এইবার থামো বাছারা, আর যে যার প্যান্ট পরে নাও, শালা তাকানো যাচ্ছে না।"

বেঁটে ছেলেটা দাঁত বের করে হাসল, "আর একটু সিদ্ধার্থদা। যাই বল, জমে গেছে মাইরি।"

লিডার ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "ওয়ান মোর সিদ্ধার্থদা, দেন ফিনিশ।"

তারপর ফ্রেশারদের দিকে তাকিয়ে লিডার ছেলেটা নিজের ডান হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠো করে ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে দোলাতে বলল, "মনে করো এটা একটা মাইক্রোফোন। আর মাইক্রোফোন বস্তুটা কোন কাজে লাগে বাপধনেরা ? গান, আবৃত্তি বা বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুখের সামনে ধরতে হয়, ঠিক তো ? আমার এই হাত-মাইক্রোফোন যেই মুখের সামনে ধরবো, সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি শুরু করে দিবি। মাইক্রোফোন বাঁয়ে গেলে তুই বাঁয়ে, ডাইনে গেলে তুই ডাঁয়ে। খবরদার, মাইক্রোফোন থেকে যেন মুখ না সরে। রেডি ?"

বেঁটে ছেলেটা নাক সিটকালো, "ধুর আবৃত্তি !"

সিদ্ধার্থ নামের ছেলেটা হাসল, "কেন, কবিতা তোর পছন্দ নয় ?"

লিডার ছেলেটার মাথায় কোন অভিনব আইডিয়া এলো বোধহয়। সে হেসে এগিয়ে গেল মাথায় তেল চুপচুপে ছেলেটার দিকে, নিজের ডান হাতের মুঠো ছেলেটার মুখের সামনে ধরে বলল, "ওকে, নো আবৃত্তি। অ্যাই তুই গাল দে, নিজের বাপকে।"

বেঁটে ছেলেটা চমকে উঠলো লিডার ছেলেটার প্রস্তাবে, তবে পর ক্ষণেই সিগারেটের ছোপ লাগা দাঁত বার করে খিকখিক শব্দে হাসল।

নবাগত ছেলেটার চোখে ঝিলিক দিল চিকচিকে হাসি, এক মুহূর্তও দেরি না করে সে শুরু করে দিল তুমুল খিস্তি, বাপের উদ্দেশ্যে।

র‍্যাগিং পর্ব শেষ হওয়ার পরে সিদ্ধার্থ ধরল ছেলেটাকে, "এই যে হিরো, কী নাম তোর ?"

"সোমনাথ।"

"কোন স্কুল ?"

স্কুলের নাম শুনে সিদ্ধার্থর চোখ কপালে ওঠে, "বর্ধমানের ছেলে তুই ? শালা, সাউথ পয়েন্টের ছেলেদের থেকেও বেশি বজ্জাত, পুরো ছুপা রুস্তম যে! তা বাপকে গালাগাল দিতে বাধলো না তোর ?"

সিদ্ধার্থর প্রশ্নের ধরণে সোমনাথ হেসে ফেলে, "কলেজে ভর্তি হওয়ার দিনই বাবা সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যদি র‍্যাগিং হয়, প্রয়োজনে শুধু বাপ নয়, চোদ্দ পুরুষকে গালাগাল দিও, তাতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না।"

সিদ্ধার্থ একটু অবাক হয় যেন, মুখে বলে, "আঙ্কলকে প্রণাম, ছেলেকে দারুণ টিপস দিয়েছেন। তা বর্ধমানে তোদের বাড়ি কোথায় ?"

সোমনাথের গলায় সামান্য দ্বিধা, "বর্ধমান শহরে নয়, আমাদের বাড়ি অনেক ভেতরে, সুকুর-গ্রামে। মা-বাবা সেখানেই থাকেন। বাবা একটা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক, সঙ্গে নিজেদের জমিতে চাষবাসের দেখাশোনাও করেন।"

"কিন্তু বর্ধমানের স্কুলে পড়তিস তো !"

"হ্যাঁ, আমার এক জ্যাঠা বর্ধমান শহরে আছেন, তাঁর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছি।"

সোমনাথের পিঠ চাপড়ে দেয় সিদ্ধার্থ, "সাবাস বেটা ! তোর সঙ্গে আমার বহুত জমবে। আজ আলাপ হল, আলাপটা প্রলম্বিত করতে একদিন বসতে হবে বুঝলি।"

প্রথম আলাপেই সিদ্ধার্থকে ভালো লেগেছিল সোমনাথের, র‍্যাগিং গ্রুপের অন্য ছেলেগুলোর মত চ্যাংড়া নয়, ভাবভঙ্গীতে একটা বেশ রাজকীয় ব্যাপার আছে। আর কী সুন্দর চেহারা ! গলার স্বরও চমৎকার। কথা বলার ভঙ্গীটি মনোরম।

দিন সাতেক পরে কলেজ ক্যান্টিনে সিদ্ধার্থর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল সোমনাথের। ক্যান্টিনে বসে সিদ্ধার্থ আড্ডা মারছিল বন্ধুদের সঙ্গে। সোমনাথকে ক্যান্টিনে ঢুকতে দেখে সিদ্ধার্থই হাত নেড়ে ডাকে। একটা লম্বা কাঠের টেবিলের দু-পাশে চারটে করে মোট আটটা চেয়ার, চারজন ছেলে আর দু-জন মেয়েকে নিয়ে সেখানে বসেছিল সিদ্ধার্থ। সামনে টেবিলের ওপর ছোট ছোট কাপে ঠাণ্ডা ম্যাড়ম্যাড়ে চা আর এক প্লেট ন্যাতানো শিঙাড়া। টেবিলের প্রত্যেকের সঙ্গে সোমনাথের পরিচয় করিয়ে দিয়ে নিজের পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে সিদ্ধার্থ বলে, "আয়, এখানে বোস সোমনাথ।"

সিদ্ধার্থর উল্টোদিকে বসেছিল দারুণ সুন্দরী অতসী, সে গজদাঁত বের করে হাসে, "আমাদের কলেজের রীতি জানিস তো? সিনিয়র মানেই দাদা আর দিদি। আমি তোর থেকে দু-বছরের সিনিয়র, তাই আজ থেকে আমি হলাম তোর অতসীদি। আর প্রথম আলাপে দিদির কিছু খাওয়ানো কর্তব্য, তাই এই নে শিঙাড়া খা, তবে আধখানা।"

ভাসা ভাসা চোখে হাসে সিদ্ধার্থ, "মাসের শেষ, পকেট ঝেড়েঝুরে ওই চারটে শিঙাড়াই হয়, আড্ডাটাই আসল বুঝলি, ওগুলো জাস্ট সামনে সাজিয়ে রাখা। তুই লাকি, তাই আধখানা পেয়ে গেলি, নাহলে অতসী যা কিপটে!"

অতসী মুখ নাড়া দেয়, "বাজে বকিস না সিদ্ধার্থ, দু-দিন যাক, সোমনাথও টের পাবে ক-টা ধানে ক-টা চাল !"

সোমনাথের কেন জানিনা মনে হল, সিদ্ধার্থ আর অতসীর ঝগড়াটা কৌতুকের ছলে হলেও পুরোপুরি বানানো নয়। সদ্য পরিচিতদের মন কষাকষির মাঝে তার খুব অস্বস্তি লাগে। সোমনাথের মুখে অস্বস্তির ছায়া হয়তো অতসীর চোখে পড়ে, সে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। অতসীর দেখাদেখি বাকি চারজনও উঠে পড়ে, তাদের ক্লাস আছে।

তবে সিদ্ধার্থ ক্লাসে যায় না, সে আজ ক্লাস কেটে কলেজ-স্ট্রীট যাবে, সেখানে তার জরুরী দরকার আছে।

বর্ধমানের ছেলে সোমনাথের জন্য ক্লাস বাঙ্ক এক গর্হিত অপরাধ। সোমনাথ মনে মনে ভাবে, কলেজ-স্ট্রীটে কী এমন কাজ আছে সিদ্ধার্থদার যে ক্লাস বাদ দিতে হল ?

তবে সোমনাথকে কোন প্রশ্ন করতে হয় না, সিদ্ধার্থ নিজেই বলে, "আমাদের একটা লিটল ম্যাগাজিন আছে, বুঝলি। সেই ম্যাগাজিনের কাজেই কলেজ স্ট্রীট যেতে হবে।"

সোমনাথ বিস্মিত হয়, বলে কী সিদ্ধার্থদা, শুধু শখের ম্যাগাজিনের কারণে ক্লাস কামাই !

সোমনাথের চোখের ভাষা হয়তো সিদ্ধার্থ বুঝতে পারে, সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, "তোর হবি কী সোমনাথ ? অবসর সময়ে কী করিস ? মানে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করিস না ?"

মাথা চুলকায় সোমনাথ, হবি ?

সুকুর গ্রামের ছেলে সোমনাথ 'হবি' নিয়ে তো কোনদিন চিন্তা করেনি ! সে বলে, "আমার ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে, তাছাড়া নিয়মিত দাবা খেলি।"

সিদ্ধার্থর চোখে কৌতুক ঝিলিক দেয়, "ব্যাটা ব্রেন টিজার ! কলেজ কম্পিটিশনে নাম দিস, দেখি কে জেতে, তুই না আমি।"

সোমনাথের গলায় উৎসাহ, "এখানে দাবা কম্পিটিশন হয় বুঝি ? তাহলে নিশ্চয়ই নাম দেব।"

"হ্যাঁ নাম দিস। গতবছর আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। শুধু খেলা কেন, আর কোন হবি নেই তোর ? আই মিন, পড়ার বইয়ের বাইরে বই পড়ার অভ্যাস আছে ? লেখালেখি করিস ? ষোলো বছর বয়সে তো সব বাঙালিই অন্তত দু-লাইন কবিতা লিখে থাকে।"

সোমনাথ মাথা নাড়ে, "না সিদ্ধার্থদা, কবিতা লেখার চেষ্টা আমি কোনদিন করিনি, ওসব আমার ঠিক আসে না, আমি মানুষটা পুরোপুরি গদ্যময়, গোয়েন্দা উপন্যাস বেশি পড়ি, অথবা ভূতের গল্প।"

সিদ্ধার্থর স্বর উদাস শোনায়, "যার কাছে ধরা দেওয়ার ঠিকই ধরা দেয় রে, শুধু আমার মত লোচ্চার কাছে সে অধরা। কত চেষ্টা করি জানিস, কিছুতেই মনের মত দুটো লাইন কলমে আসে না। যাকগে, কখনও যদি কবিতা লেখার মন হয় আমাদের ম্যাগাজিনে দিস, সম্পাদকের পছন্দ হলে ছাপাখানা অবধি পৌঁছে দেব।"

সোমনাথ হা করে তাকিয়ে থাকে, মনের মধ্যে কৌতূহল মাথা চাড়া দেয়। দু-লাইন কবিতার জন্য যে সিদ্ধার্থদার এত আকুলিবিকুলি, সেই সিদ্ধার্থদা মানুষটা আদপে কেমন ?

সিদ্ধার্থর প্রতিটি মতে যে সোমনাথের সায় থাকে এমন নয়, সিদ্ধার্থর সঙ্গে সোমনাথের যে রুচিতে খুব মিল তাও নয়, তবু কেমন করে যেন সিদ্ধার্থর চ্যালা হয়ে পড়লো সোমনাথ। সিদ্ধার্থর রাজকীয় চালচলন, ব্যবহার, কথাবার্তার প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করতো সে।

একদিন কলেজ ক্যান্টিনে অতসী ঠাট্টা করে বলল, "জানিস সোমনাথ, জমিদারি চলে গেলে কী হবে, জমিদারি মেজাজটা এখনও রয়ে গেছে সিদ্ধার্থর।"

সেই সোমনাথ শোনে যে সিদ্ধার্থরা একসময় জমিদার ছিল। সিদ্ধার্থ জমিদার বংশের ছেলে জেনে সোমনাথ মনে মনে দমে যায়, তবু সে চেষ্টা করে মুখের হাসি ধরে রাখে।

অতসীর চোখে চোখ রেখে, দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ বলে, "ঠিকই বলেছিস অতসী, শুধু মেজাজটাই পড়ে আছে, নাহলে তালপুকুরে আর ঘটি ডোবে না, সময় থাকতে ফুটো জমিদার তনয়কে ছেড়ে শাঁসালো ব্যবসায়ী খুঁজে নে, নাহলে পরে পস্তাতে হতে পারে।"

সিদ্ধার্থ আর অতসীর খেলার ছলে ঝগড়ার মাঝে সোমনাথ আর বসেনি, সে চায়ের কাপ অর্ধসমাপ্ত রেখে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে পড়ে। সামনেই সেমেস্টার এক্সাম, এখনও তার অনেক বিষয়ের অধ্যয়ন বাকি আছে। আজ আর আড্ডা নয়, এখন দুপুর তিনটে, এখনই হোস্টেলে ফিরে যাওয়া শ্রেয়, রাত বারোটা অবধি টানা লেখাপড়া করতে পারলে গোটা চারেক চ্যাপ্টার তৈরি হয়ে যাবে।

হোস্টেলে ফেরার পথে পরীক্ষার চিন্তার মাঝে বারেবারে সোমনাথের মাথায় হানা দিচ্ছিল সিদ্ধার্থ প্রসঙ্গও। ছোট থেকেই জমিদারি প্রথার প্রতি সোমনাথের তীব্র বিতৃষ্ণা। অথচ কী অদ্ভুত ব্যপার, কলেজে বেছে বেছে সেই জমিদার বংশের ছেলের সঙ্গেই তার গাঢ় বন্ধুত্ব হল !

সিদ্ধার্থর সঙ্গে সোমনাথের বন্ধুত্ব নিয়ে একদিন পিড়িক মারলো ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অতনু। অতনুর অঙ্কে খুব মাথা, কিন্তু এঞ্জিনিয়ারিং-ড্রয়িং একদম পারে না। মাঝে মাঝে হোস্টেলে সোমনাথের ঘরে আসে ড্রয়িং-য়ের সমস্যা নিয়ে।

সেদিন ড্রয়িং-য়ের কাজ শেষ করে দু-জনে চা খাচ্ছিল, অতনু হঠাৎ বলল, "সিদ্ধার্থদার সঙ্গে তোর কী করে চেনা হল রে?"

সোমনাথ হাসে, "সেই র‍্যাগিংয়ের সময়, মনে নেই ?"

অতনু গম্ভীর মুখে বলে, "সিদ্ধার্থদা আমাদের পাড়ার ছেলে, মালটাকে ভালো করে চিনি, হেভি ফাটুস। ওদের পুরো খানদানেরই খুব ফাট। পড়ে মেটালারজি, ভাবখানা যেন ইলেক্ট্রনিক্সের ছাত্রদের সমান !"

কে কী নিয়ে পড়ছে, ছাত্র হিসেবে কতটা মেধাবী, সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায় সোমনাথ, সে শুধু জিজ্ঞাসা করে, "কেন, ফাট কেন ?"

অতনু কাঁধ ঝাঁকায়, "মে বি ফর লুকস ! সিদ্ধার্থদার চেহারা সাহেবদের মত, বোনটাও হেভি সুন্দরী, রূপের গর্ব আছে দত্তদের। তবে ফালতু মাল। তুই-আমি এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে একটা ভালো চাকরির অপেক্ষায় আছি। আর সিদ্ধার্থদা দু-বার ড্রপ মেরে এখনও রাতদিন বিড়ি ফোঁকে আর মেয়ে দেখে।"

সোমনাথের স্বরে স্পষ্ট আপত্তি, "বাজে কথা বলিস না অতনু। অতসীদির সঙ্গে প্রেম করে সিদ্ধার্থদা। অন্য মেয়ে দেখবে কেন ?"

অতনুর গলায় ঝাঁজ, "উইদাউট ইনফরমেশন কথা বলছি না বস, আমি সাউথ-পয়েন্টের ছেলে, অতসীদির বেস্ট ফ্রেন্ডের বোনের সঙ্গে আমার টুয়েলফথ-ক্লাসের প্র্যাক্টিক্যাল পার্টনারের হেভি দোস্তি। তার থেকে শুনেছি। সিদ্ধার্থদা অতসীদির তিন নম্বর। আর হ্যাঁ, খবর আছে, অতসী একবার অ্যাবরশনও করেছে।"

সুকুর গ্রামের ছেলে সোমনাথ, অ্যাবরশনের খবরে কেমন দমে যায়। সোমনাথ শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করে, "কী বলতে চাইছিস তুই ?"

অতনু বিজ্ঞের স্টাইলে বলে, "এরা সব সাতঘাটের জল খাওয়া মাল, সাবধানে মেলামেশা করিস। বাপ কষ্ট করে পড়াচ্ছে তোকে, কী দরকার তোর এদের মত মানুষদের ফাঁদে পা দেওয়ার ?"

সোমনাথের গলা চিরেতার জলের মত তেঁতো শোনায়, "হ্যাঁ, আমার বাবা কষ্ট করে পড়াচ্ছেন, বাপ নয়।"

সিদ্ধার্থদার প্রতি সমালোচনায় অতনুর সঙ্গে গলা না মেলালেও সোমনাথের মনে সিদ্ধার্থ সম্পর্কে বিবিধ প্রশ্ন জাগে। কেমন ছেলে সিদ্ধার্থদা? তাদের পরিবারই বা কেমন ? একদা জমিদার বংশের ছেলে সিদ্ধার্থদার বাবা বর্তমানে রুজিরুটির জন্য কী করেন ? সিদ্ধার্থদার একটাই বোন ? অতনু বলল, সিদ্ধার্থদার বোন খুব সুন্দরী। কত সুন্দরী ? কোন ক্লাসে পড়ে সে ? কী নাম তার ? তবে স্বীকার করতেই হবে, অতনুর থেকে সিদ্ধার্থদার কথাবার্তায় শালীনতা বেশি।

চা-শিঙাড়া সহযোগে কলেজ ক্যান্টিনের আড্ডায় গ্রামের ছেলে বলে সোমনাথকে কখনও সিদ্ধার্থদা অবহেলা করেনি। কোলকাতা শহরের সঙ্গে সুকুর গ্রামের তুলনা করে ঠাট্টার ছলেও কোনদিন হাসাহাসি করেনি।

বরং জীবনানন্দ দাশের কবিতা দু-চার লাইন আবৃত্তি করে জিজ্ঞাসা করেছে, "হ্যাঁ রে সোমনাথ, তোদের গ্রাম কি সত্যি সত্যিই এরকম ?"

সোমনাথের কাছে খুঁটিয়ে শুনতে চেয়েছে গ্রামের মানুষের গল্প, তাদের প্রতিদিনের জীবনের ডিটেইলস, আরও কত কী। আর ইউনিভার্সিটিতে ডাকসাইটে সুন্দরী মেয়ে হল অতসীদি, খুবই আধুনিকা, কলেজে সবসময় স্লিভলেস ব্লাউজ পরে আসে, ব্যবহারও কী মিষ্টি! বললেই তো হল না, অতসীদির পাশে সাহেবের মত চেহারার সিদ্ধার্থদাকেই সবচাইতে বেশি মানায়।

সোমনাথ নিজের মনে হেসে ফেলে, অতনুর সিওর আঙুর ফল টক কেস, নিজে সুন্দরী গার্ল ফ্রেন্ড জোটাতে পারছে না, তাই শুধুমুধু সিদ্ধার্থদাকে গাল দিচ্ছে। নাহলে মেয়েদের ব্যাপারে অতনু নিজে যেন কিছু কম যায়!

হালে হিস্ট্রি অনার্সের একটা মেয়ের সঙ্গে অতনুকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা কানে ইয়া বড় বড় দুল পরে। আর অতসীদির মত শাড়ি নয়, সালোয়ার কামিজ পরে কলেজে আসে। ভীষণ মোটা মেয়েটা।

সোমনাথ মনে মনে জিভ কামড়ায়। তাদের বাড়িতে মেয়েদের আকৃতি নিয়ে মন্তব্য দূরের কথা, চিন্তা করাও বারণ। তবে কোলকাতার কলেজে পড়তে এসে সোমনাথও ধীরে ধীরে শহুরে হয়ে যাচ্ছে, তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসছে, কথাবার্তাতেও চৌকস হয়ে উঠছে।

সেদিন লাইব্রেরিতে বসে সোমনাথ নোট তৈরি করছিল। অতসী এসে সোমনাথের উল্টোদিকের চেয়ারটা টেনে বসলো। সোমনাথ আড়চোখে খেয়াল করলো অতসীকে, তবে খাতার পাতা থেকে ঘাড় ওঠাল না, নিজের কাজেই ব্যস্ত রইলো। অতসীর হাতেও একটা মোটা বই ছিল, সে মনোযোগ দিয়ে বইয়ের পাতা ওলটাতে শুরু করলো।

মিনিট পনেরো বাদে হাতের বই মুড়ে এক পাশে রেখে চেয়ারের ওপর পা তুলে আলগোছে বসে অতসী, জিজ্ঞাসা করে, "কী এত কপি করছিস রে সোমনাথ? এতগুলো চ্যাপ্টার হাতে লিখতে তো রাত কাবার হয়ে যাবে। জেরক্স করে নিচ্ছিস না কেন ?"

খাতার পাতা থেকে চোখ তোলে সোমনাথ, মৃদু হাসে, "জেরক্স করতে পয়সা লাগে অতসীদি।"

অতসী ভ্রুকুটি করে, "গ্রামের মানুষদের এই এক দোষ, সবসময় শহুরে সুবিধাগুলো অ্যাডপ্ট করতে দেরি করে।"

"গ্রামে কাঁচাপয়সা কম অতসীদি, তাই ভেবেচিন্তে খরচ করতে হয়।"

"আহা, অত জমি তোদের ! চাল, ডাল, সবজী সবই তো ক্ষেত থেকে ঘরে আসে, বাজার থেকে কিছুই কিনতে হয় না। গোয়ালে গরু-ছাগল, বালতি ভরে দুধ দিচ্ছে। তাহলে আবার পয়সার চিন্তা কেন ?"

তাদের গল্পের মাঝে কখন যে সিদ্ধার্থ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে, দুজনেই তা খেয়াল করেনি।

অতসীর কথার পিঠে সিদ্ধার্থ হেসে বলে, "তা গ্রামে যখন এত সুবিধে, শহর ছেড়ে গ্রামে বসবাস করলেই হয়। সবই তো ফ্রী-তে। নো ইনকাম, নো ইনকাম-ট্যাক্স, বিন্দাস জীবন।"

অতসী হাত নেড়ে বলে, "আহা, আমি যেন তাই বলেছি ! গ্রামে যেমন অনেক ভালো আছে, তেমন অনেক অসুবিধাও আছে। জল, ইলেক্ট্রিসিটি, কম্যুনিকেশন এসব নিয়ে তো বহু সমস্যা।"

সোমনাথকে দলে টানার চেষ্টা করে সিদ্ধার্থ, "দেখলি সোমনাথ, অতসী কেমন পাল্টি খেয়ে গেল! এই পাড়াগাঁয়ের তুল্য জায়গা নেই, আবার সেই পাড়াগাঁয়েরই কত দোষ।"

খাতার ওপর হাতের পেনটা গোল করে ঘোরাতে ঘোরাতে সোমনাথ বলে, "চাল, ডাল, সবজী কিন্তু ফ্রী-তে হয় না। ওগুলো ক্ষেতে উৎপন্ন করতে রীতিমত ঘাম ঝরিয়ে চাষ করতে হয়। তবে আছে ফ্রী-তে, মুক্ত বাতাস, স্বচ্ছ আকাশ।"

বাঁ-চোখে উইঙ্ক করে সিদ্ধার্থ হাসে, "আর পাওয়া যায় সরল মন।"

অতসী তেড়ে ওঠে, "মানে ?"

সিদ্ধার্থ চোখ সরু করে তাকায়, "চল সোমনাথ, একবার ঘুরে আসি তোদের গ্রামে, নিজেদের ক্ষেত থেকে তোলা ডাল সব্জি টেস্ট করে দেখি। তবে একা নয়, অতসীকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। যাবি না অতসী ?"

সোমনাথ মনে মনে প্রমাদ গোনে। সর্বনাশ, সিদ্ধার্থদা একা হলে একরকম, তাই বলে সঙ্গে অতসীদিও !

গ্রামের বাড়িতে একা সিদ্ধার্থদাকে নিয়ে যাওয়া কোন সমস্যাই নয়, বাবা-মা খুব খুশি হবেন। তাই বলে সঙ্গে স্লিভলেস ব্লাউজ পরা অতসীদি চলবে না। স্লিভলেস ব্লাউজটা কোন ব্যাপার নয়, আজকাল গরমকালে সোমনাথের-মা নিজেই বাড়িতে তাই পরেন। তবে একজন মহিলা দু-জন পরপুরুষের সঙ্গে বাড়ির বাইরে রাত কাটাবে, সেটা বোধহয় মা-বাবার হজম হবে না।

সোমনাথকে বাঁচিয়ে দেয় অতসী নিজেই, সে একটা বড় হাঁই তুলে বলে, "নো হার্ড ফিলিংস। আমার হবে না রে, তুই একা ঘুরে আয় সিদ্ধার্থ।"

(চলবে)

স্বপ্না মিত্র একজন প্রবাসী বাঙালি। বিজ্ঞানের ছাত্রী। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে রেডিও-ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বি-টেক করে বেশ কিছুদিন দেশি এবং বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। চিরদিনই হার্ডকোর হবি ছিল রিডিং, লেখালেখি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ভালোবাসার জায়গা। ইদানীং বেশ কিছু লেখা আত্মপ্রকাশ করেছে প্রিন্টেড ম্যাগাজিনে (দেশ, সানন্দা, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্তমান, আনন্দমেলা, বাংলা ফেমিনা, আনন্দবাজার, আজকাল), বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে এবং বই হিসেবে।

স্বর্ণালী সাহা

কফির মৌতাতে আড্ডা

কলকাতার ক্যাফে কালচার ইতিমধ্যে রমরম করে চলছে। কলকাতার গোড়াপত্তনের সময় থেকে চায়ের মজলিস চলে আসছে। পাড়ার মোড়ে মোড়ে চা-এর দোকান আর তাকে কেন্দ্র করে আড্ডা। কিন্তু ক্যাফে সম্পূর্ণরূপে একটি বিদেশী ধ্যানধারণা। এক একটি করে শুরু হতে হতে এখন প্রায় ৯০ টির মতো ক্যাফে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে গড়ে উঠেছে। এখানে ইন্ডিয়ান কফি হাউস থেকে আধুনিক কলকাতার ক্যাফে কালচার নিয়ে আলোচনা করবো সঙ্গে কফির মৌতাতে আড্ডাও।

ইন্ডিয়ান কফি হাউস, যার নাম আঠারো থেকে আশি সকলের কাছেই পরিচিত, ১৯৪২ সালে কফি বোর্ড অ্যালবার্ট হলে কফির দোকান খোলে যা কলেজ স্ট্রিটে ছিল। প্রথমদিকে কফি হাউস সরকারের অধীনে ছিল, পরে ১৯৪৭ সালে এর নাম বদল হয়। ১৯৪৮ সালে কোঅপারেটিভ-এর অধীনস্থ হয় এই কফি হাউস। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অধ্যাপক নির্মলেন্দু গাঙ্গুলীর হাত ধরেই আজকের এই কফি হাউসের সৃষ্টি। উনি বলেছিলেন ছেলেরা তথা ছাত্রছাত্রীদের বসার স্থান কোথায় হবে কফি হাউস বন্ধ হয়ে গেলে ? ওনার কথাতেই পরবর্তী সময়ে ওনার পুত্র কমলেন্দু গাঙ্গুলী এই কফি হাউস চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন।

স্বনামধন্য ব্যক্তিদের পদধূলীতে ধন্য এই কফি হাউসে কে না এসেছেন। নেতাজী, সত্যজিৎ রায় থেকে বর্তমান যুগের অনুপমখের, রাজা মুরাদ (রাবন চরিত্রের জন্য বিখ্যাত), অমরেশ পুরী, রিচা চাড্ডা, সংগীত জগতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী মান্না দে প্রমুখরা। রীতিমতো সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র বলা যেতে পারতো সেই সময়ের এই কফি হাউসকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতনামা লেখক, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক পরিচিত লেখার সৃষ্টি এই কফি হাউসে বসেই। মান্না দের সেই গান ''কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই'' . . . কফি হাউসের বর্তমান সেক্রেটারির মোবাইল-এ রিং টোন বেজে উঠল আলাপচারিতার সময়।

শিক্ষিত মানুষজন, ছাত্রছাত্রীরাই তাদের নানারকম আলোচনা ও আড্ডার মধ্যে দিয়েই এই কৌলিন্যকে ধরে রেখেছিল। প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীও এখানে এসেছেন। বর্তমান ইন্ডিয়ান কফি হাউসের সেক্রেটারি সরফরাজ আহমেদ বললেন, হায়দ্রাবাদ থেকে কফি আসে এখানে। আরও বলেন ১লা এপ্রিল থেকে স্পেশাল কোল্ড কফি আনা হচ্ছে যা হাতের বদলে মেশিনে তৈরী হবে। ''ইনফিউশন'' বা ব্ল্যাক কফির চাহিদা আগে খুব বেশি থাকলেও দিনে দিনে তা কমেছে, যার ইঙ্গিত দিলেন কফি হাউসের এক কর্মী। অতি সম্প্রতি লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় হাসিমুখে বললেন, ''গরম দুধের কফি এবং বরফ বা কোল্ড কফিও ছেড়ে দেওয়া যায় না''। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি বিদেশীদের আনাগোনাও এখানে নিয়মিত। অ্যালেন গিনস্ বার্গ এবং গুন্টার গ্রাস-এর মতো স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরাও এখানে আসতেন।

এরপর আসা যাক ক্যাফে কালচারের দিকে। ইন্ডিয়ান কফি হাউস পুরানপন্থী আর আধুনিক ক্যাফে গড়ে উঠছে অভিনব সব ভাবনাচিন্তা নিয়ে। এসপ্রেসো মেশিন থেকে মিক্সড বরফ কফির ওপর আইসক্রিম সংমিশ্রণে যেমন ইন্ডিয়ান কফি হাউস কফি পরিবেশনে অভিনবত্ব দেখাচ্ছে, ঠিক তেমনই আবার রংবেরঙের ঠান্ডা পানীয় পাওয়া যাচ্ছে এই আধুনিক ক্যাফেগুলিতে। তাদের আছে হরেক রকম রাশভারী সব নাম, যেমন মোজিটো, পাইন্যাপেল, জিঞ্জার, শার্লি টেমপল, মিমোসা, ম্যাঙ্গো, অরেঞ্জ, মোজিটো ইত্যাদি।

ক্যাফে হল আকারে ছোট ঘরোয়া পরিবেশ নিয়ে তৈরী হওয়া সরাইখানা বা আস্তানার মতো, যেখানে বসে থাকা যায় ঘন্টার পর ঘন্টা, নিজের কাজ করা যায়, আড্ডা দেওয়া যায়, আর তার সঙ্গে উপরি পাওনা তার সাজসজ্জা ও আবহ সংগীত। প্রাতঃরাশ থেকে শুরু করে ডিনার পর্যন্ত সবরকমের ব্যবস্থাই থাকে এই ক্যাফেগুলোতে। ''দ্যা ওয়াইস আউল

ক্যাফে এ্যান্ড স্টকহাউস '' এই রকম একটি জায়গা, যেখানে রংবেরঙের পেঁচা দিয়ে সজ্জিত ক্যাফে। তা কাঠের, মেটালের, সবরকমের আছে। প্রাতঃরাশের জন্য এই ক্যাফের নামডাক ও রয়েছে এই কলকাতা শহরে। চিকেন টু-লেয়ার স্যান্ডুইচ, চিপস, কফি, নানারকম ঠান্ডা সরবত কি না আছে, সঙ্গে উপরি পাওনা সুন্দর তাদের পরিবেশন।

করোনা আবহে সর্বক্ষণ ঘরে বসে অফিসের কাজ করার অভ্যাস আমাদের যেমন হয়েছে, তেমনই আবার রাজারহাট কফি হাউসের ব্যবস্থা আছে অফিসের কাজ করার। আছে লাইব্রেরির সুবিধা। যা সময় কাটানোর একটি বিশেষ উপায়। হরেকরকম বাংলা থেকে ইংরাজী বইয়ের সম্ভার। ফিস ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন ওমলেট, বেকড ফিস, অ্যাপেল পাই আর আছে সুস্বাদু কফি, চা-এর সম্ভার।

ইতালিয়ান, চাইনিজ, লেবানিজ খাবারের পসরা নিয়ে তৈরী কলকাতাতে ''সিয়েনা স্টোর এ্যান্ড ক্যাফে'' এদের বৃহত্তর রেঞ্জের খাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। আছে মিষ্টিমুখ থেকে স্যালাড সব কিছু। আর আছে সুন্দর ঘরসজ্জার জিনিসের সঙ্গে স্টাইলিশ পোশাকের সম্ভার।

''ক্যাফে স্টোরি বাই চায়ে রেক'' এরা ইতালিয়ান এবং কন্টিনেন্টাল খাবার পরিবেশন করেন সম্পূর্ণ নিরামিষ ভাবে।

''ট্যালেভলিটান'' ক্যাফে যার সজ্জা সম্পূর্ণ ভ্রমণের ছবি দিয়ে। তাতে যেমন সত্যি ভ্রমণের ছবি রয়েছে, তেমনি কমিক্স, ডিটেকটিভ টিনটিন-এর সারা পৃথিবী ভ্রমণের ছবি ও ম্যাপ দিয়ে ক্যাফের সাজ হয়েছে।

''এইট ডে ক্যাফে'' আমেরিকান বেকারি এবং বিশ্রামের সঙ্গে ভালো খাবারের এই ক্যাফেও কলকাতাতে রমরম করে চলছে।

এছাড়াও আছে ''ক্যাফে কফি ডে'' যেখানে পাওয়া যায় গরম কফি। কফিতে থাকে অঙ্কন। আরও আছে ''প্যারিস ক্যাফে'', ক্যালকাটা সিক্সটিফোর ক্যাফে'', ''হক রুম ক্যাফে''। কলকাতাতে বর্তমানে ক্যাফের ছড়াছড়ি। দিনে দিনে মানুষের ব্যস্ততা যত বেড়েছে, হালকা মেজাজে সময় কাটানোর স্থলও গড়ে উঠেছে।

এমনকি রাজ্য সরকারের তৈরী করা ''সম্পন্ন পার্কোম্যাট ক্যাফে'' — যেখানে দিন ও রাতের গাড়ি পার্কিং-এর সঙ্গে রয়েছে ক্যাফে। সেখানে বিশ্রাম নিতে পারবেন মানুষজন, সঙ্গে আছে খাওয়ার ব্যবস্থা। বিশ্ববাংলার অধীনে আছে আলিপুর জেল মিউজিয়ামের মধ্যেও কফি হাউস। ঐতিহাসিক স্থল ঘুরে দেখার সঙ্গে এখানেও ক্যাফের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া পোস্ট অফিসের মধ্যে ক্যাফে, যা ''কলকাতা জিপিও ক্যাফে'' নামে পরিচিত বর্তমানে। চিঠি, উপহার প্রিয়জনকে পাঠানোর সময়েও একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্য কলকাতার বৃহত্তম পোস্ট অফিসে এই ব্যবস্থা। ভারতের নামকরা পোশাক বিপণী ''ফ্যাব ইন্ডিয়া'র আউটলেটে আছে ''কফি এন মুড্''।

এখানেই ক্যাফে কালচারের ইতিবৃত্তি। ইন্ডিয়ান কফি হাউসের বহমানতা, হাত ছেড়ে মেশিন কফি আর ক্যাফেতেও স্যান্ডুইচ ওমলেটের সঙ্গে কফি ও চায়ের পরিবেশন মানুষের আড্ডার মেজাজকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। হালকা মেজাজে দিনের কিছুটা সময় অতিবাহিত করার সুবিধা কলকাতার ক্যাফে কালচারের দৌলতে এনেছে এক নতুন জোয়ার।

Swarnali Saha completed her Master's in Journalism & Mass Communication at Visva-Bharati with a First Class and thereafter had stints with important print & electronic media houses. Now, she pursues the career of an educator and spends her free time in chronicling life in Kolkata through the prism of her mind's eye.

পুনরীক্ষণ: পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

গ্যালিয়ানোর আয়না ও অন্যান্য কবিতা

যে-ভাষায় আমরা নিত্যকার জীবনযাত্রা চালাই, আপিসে কর্মক্ষেত্রে আড্ডায় আমরা কথাবার্তা বলি, তার হুবহু ভঙ্গিতে সাহিত্যসৃজন সম্ভব নয়। সাহিত্যস্রষ্টা সাহিত্যের ভাষা নিজেই সৃষ্টি ক'রে নেন। বাংলার প্রাচীন ও মধ্য-যুগে তো কাব্যের ভাষানির্মাণের স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিলো। বিশ শতকেও তার কিছু রেশ র'য়ে গিয়েছিলো, শব্দ চয়নে ও প্রকাশভঙ্গিতে। এমন কাব্যিক ভাষার কদরও ছিলো। কিন্তু আধুনিকতামনস্ক কবিকুল রবীন্দ্রযুগের শেষ পাদ থেকে এরকম বাঙনির্মান অবাঞ্ছিত মনে করেন। তাঁদের কাব্যের ভাষা তাঁদের প্রাতিজনিক রুচি ও সৃজনভঙ্গির অনুশাসনেরই অধীন। কখনো দৈনন্দিন কথাবার্তার বাকগঠন ও তার সম্পৃক্ত অন্যান্য উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং বলাই বাহুল্য পূর্বের কাব্যিক তকমাগুলি দিয়ে রচনাকে অলঙ্কৃত করার তাগিদও আধুনিক কবিতাকৃতিতে লক্ষণীয় নয়।

"গ্যালিয়ানোর আয়না"-র কবিতাগুলির ভাষা কবি স্বপন ভট্টাচার্যর স্বকীয় উদ্ভাবন। সংকলনের শিরোনাম আখ্যায় প্রথম সাতটি কবিতা সংখ্যাক্রমে সাজানো হয়েছে। বাকী আটচল্লিশটি কবিতা আপন আপন শিরোনামে উপস্থাপিত। প্রতিটি কবিতাই সাদাসাপ্টা বাগ্‌ভঙ্গিতে মৃদু কিন্তু বলিষ্ঠ ভাবে উচ্চারিত। ভাষার এই সাদাসাপ্টা ও বলিষ্ঠ রূপটি কবি এদুয়ার্দো হিউজ গ্যালিয়ানোর (১৯৪০-২০১৫) "আয়নাগুলি: প্রায় প্রত্যেকের কাহিনীমালা" (Mirrors: Stories of Almost Everyone) শীর্ষক অতিখ্যাত সংকলনের অন্তর্ভূত কবিতাগুলির রূপান্তরের শুভক্ষণে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকবেন।

এইখানে কবিতার ভাষান্তর সম্পর্কে একটু বলি। কবিতার বাক্য গঠনে কবির যে-স্বকীয়তা প্রস্ফুটিত হয়, তার অন্তর্ভুক্ত থাকে বাক্যে শব্দের ও শব্দগুচ্ছের স্থানান্তরজনিত একপ্রকার ভঙ্গি, একই শব্দের একাধিক দ্যোতনা, যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি। এমন কি গদ্যিকবিতায় ভাবনাভূমির আধিপত্য থাকলেও ভাষার কারুকার্যের বৈশিষ্ট রূপান্তরিত সৃজনে উপস্থাপন করা অসম্ভব মনে করি। তাই রূপান্তরিত কবিতাও স্বভাবতই একটি মৌলিক সৃজনকৃতি হ'য়ে ওঠে।

বর্তমান ইংরেজি কবিতা আলোচনায়, বিশেষ ক'রে কমনওয়েল্‌থ দেশপুঞ্জের যে দেশগুলিতে সৃজনকর্মে মাতৃভাষার পরিবর্তে দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজির ব্যবহার দেখি, এই অনুবাদ বা রূপান্তরকে ট্রানস্লেশন না ব'লে ট্রানক্রিয়েশন

(transcreation) বা সৃজনান্তর বলেন কেউ কেউ। অর্থাৎ যাঁরা বলেন তাঁরা স্বীকার করেন যে কবিতার ঠিক অনুবাদ হয় না, যা হয় তা একটি নতুন নির্মাণ।

স্বপনের সংকলনের প্রথম সাতটি কবিতা এমনি সৃজনান্তরিত নতুন নির্মাণ।

আসলে এই নির্মাণগুলি ও বাকি কবিতাগুলি একই সূত্রে গাঁথা – কী ভাবনাভূমিতে, কী অবয়ব গঠনে, কী ছেদপাতবিন্যাসে। অবশ্য শিরোনামশোভিত কয়েকটি কবিতাঅবয়বে ছন্দ-বদ্ধতার পরীক্ষানিরীক্ষা কিছু হয়েছে। ভাবনাভূমিতে মৌলিক এক জিজ্ঞাসা: এই সৃষ্টির উৎপত্তি কী ভাবে, তার প্রসারই বা কেন বা কী ভাবে। রচনার অবয়বে যে – গদ্যভঙ্গি চয়িত হ'য়েছে তা পর্বভাগ ও ছত্রগ্রন্থির সঙ্গে একটি সাযুজ্য রক্ষা ক'রে দৃঢ় পদক্ষেপে বহমান। কিন্তু ছেদচিহ্নহীন কবিতা, যেমন প্রথম কবিতাটি, এবং আরও কয়েকটি কবিতা, একটা বহমান ঘটনাধারা ও ভাবস্রোতের ধারণা দে'য়। ছেদচিহ্নের এরকম বিন্যাসে সম্ভবত সব কবিতাতেই অভিপ্রেত কবির। তবে এই বিন্যাসআদর্শ কিন্তু সর্বত্র অনুসৃত হয় নি।

বিষয়চয়ন শুধু সৃষ্টিতত্ত্বর পরিধিতে আবদ্ধ নয়। বিষয়- ও প্রসঙ্গ-বৈচিত্র্যও লক্ষ্যণীয়, বিশেষ ক'রে শিরোনামশোভিত কবিতাগুলিতে। দৈনন্দিন তুচ্ছ অভিজ্ঞতা, যেমন "শর্ট কাট", তাৎক্ষণিক অনুভব, যেমন "অসমাপ্ত", মৃত্যু ও মৃত্যুবোধ ও -আবহ, যেমন "শ্মশান", বৈজ্ঞানিক -তত্ত্ব ও -প্রেক্ষিত, যেমন "বালকের ঈশ্বর" – এই রকম ভাবনাভূমির নানা অঙ্গন কবির বিচরণক্ষেত্র।

কয়েকটি কবিতা ছন্দ-বদ্ধ হয়ে পঙ্ক্তির স্পন্দতরঙ্গ মাত্র অবলম্বন ক'রে শ্রুতিসুখকর হয়েছে, যেমন "আর কিছু না"। এই কবিতাটি সংকলনের সব থেকে চিত্তাকর্ষক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। ছত্রান্তে অনুপ্রাস নেই, পর্বগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলা প্রাকৃত ছন্দে নিখুঁত ভাবে নির্মিত। এরকম নিরলঙ্কার ভাষায় সহজ ক'রে লেখা পাকা হাতেই সম্ভব।

কবিতার অবয়বে চিত্রকল্প বা imagery ব্যবহারে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন কবি। যেমন "ছাতা" কবিতার শেষ তিনটি ছত্রে দেখি

কনিফার বীজের মতো
তোমার বাড়ানো হাত থেকে
ছাতা উড়ে যায়

এই অংশের চিত্রকল্পটি পূর্বের স্তবকান্তর্ভূত ভাবধারার ঘটনাদুটিকে প্রস্ফুটিত করেছে। কাজটি চমক দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাধিত হয় নি। হয়েছে সমগ্র কবিতাটিকে পুনরন্বেষণের তাগিদে।

পৃথ্বীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩৩-এ। পড়াশুনো শান্তিনিকেতন, কোলকাতা এবং শিকাগোয়। সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন পাপুয়া নিউ গিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা, গল্প ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কোলকাতা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকা থেকে। আইওয়াতে ১৯৭৬ এর আন্তর্জাতিক রাইটিং ওয়ার্কশপে এবং ১৯৮২ তে ব্রিসবেন শহরে কমনওয়েলথ রাইটিং কনফারেন্সে আমন্ত্রিত ছিলেন। এখনও লেখালেখির মধ্যে রয়েছেন। থাকেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড শহরে।

উদ্দালক ভরদ্বাজ

সোফিয়া (মূল রচনাঃ জোয়ান লগহি (Joan Logghe): লা পুয়েবলা, নিউ মেক্সিকো)

কবি পরিচিতিঃ জোয়ান লগহি নিউ মেক্সিকোর কবিতার নব জাগরণের সাথে বহু বছর ধরে একাত্ম, জোয়ান লগহির জন্ম হয় ১৯৪৭ সালে, ফিলাডেলফিয়ার পিটসবার্গে। কবিতা ও শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত, জোয়ান, স্বামী মাইকেলের সঙ্গে নিউ মেক্সিকোর লা পুয়েবলা শহরে, যে বাড়িটিতে থাকেন, সেটি তৈরি করেছেন তাঁরা নিজেরাই। তিন সন্তান ও তিন নাতিনাতনি তাঁদের। জোয়ান, টাফটস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেন ক্লাস পোয়েট হয়ে এবং অচিরেই Academy of American Poet's College পুরস্কারও পান। কবিতা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ শুরু করেন তিরিশ বছর আগে, মেয়ের স্কুলে। তারপর থেকে কবিতাই জীবন।

সান্টা-ফের Poet Laureate (২০১০-২০১২) পুরস্কারে পুরস্কৃত কবি লগহি Mothering Magazine-এর সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘ সাত বছর। ১৯৯১ সালে "ন্যাশনাল এন্ডাউমেন্ট ফর দা আর্টস ইন এডুকেশন" লাভ করেন তিনি, কবিতায় শিল্পকলার ক্ষেত্রে। শিক্ষাক্ষেত্রে কলার প্রয়োগের ওপরে বিবিধ কর্মশালার আহবায়ক এবং শিক্ষক ছিলেন, "মেক্সিকো স্টেট পেনিটেনশিয়ারি", "আরমান্ড হ্যামার ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজ", "নিউ মেক্সিকো স্কুল ফর দা ডেফ" সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সান্টা-ফের এইডস-আক্রান্ত রোগীদের স্বার্থে নানাভাবে নানা জায়গায় আবেদনের কাজে গঠন করেছেন WRITE ACTION লেখকদের গ্রুপ; সংগঠন করেছেন এই সংক্রান্ত অনুষ্ঠান এবং কর্মশালারও। এই কাজের ফলস্বরূপ, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় Catch Our Breadth: Writing from the Heart of AIDS গ্রন্থটি।

একক প্রকাশনার সংখ্যা ছয়। প্রথম কাব্যগ্রন্থ What Makes a Woman Beautiful প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে। এর পরে Twenty Years in Bed with the Same Man (১৯৯৫), দ্বিভাষিক Sofia (১৯৯৯), Blessed Resistance (১৯৯৯), Rice (২০০৫), The Singing Bowl (২০১১) এবং সর্ব শেষ গ্রন্থ, Unpunctuated Awe: Poems of Santa Fe ছাপা হয় ২০১৬ সালে। এ ছাড়া, রেনি গ্রেগারিও ও মিরিয়াম সাগানের সাথে যৌথ সঙ্কলন Love & Death: Greatest Hits (২০১১), মিরিয়াম সাগানের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনায় Another Desert: Jewish Poetry of New Mexico (১৯৯৮) কাব্যসঙ্কলনটি।

সোফিয়া সিরিজের কবিতাগুলি প্রসঙ্গে

Sofia (১৯৯৯) কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সোফিয়া সিরিজের কবিতাগুলি একসঙ্গে পড়লে একটা গল্প জেগে ওঠে মনে। স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত, ক্যাথলিক এক মহিলার জীবনের গল্প, যার শিকড়ে লেগে রয়েছে, পঞ্চদশ শতাব্দিতে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে বিতাড়িত শেফার্ডিক ইহুদিদের কান্না ও লড়াইয়ের মর্মন্তুদ ইতিহাসও। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যেখানে সমষ্টির সামগ্রিক স্মৃতিকথার সঙ্গে মিশে যায়, অনুভবের সেই অলৌকিক সোপানে সৃষ্টি এই কবিতাগুলির। লগহির অপূর্ব চিত্রকল্প একের পর এক কবিতায় এঁকে চলে এই অসামান্য নারীদের জীবনের এক ঠাসবুনোট গল্প, যেখানে সাহস ও নিরাশা, আনন্দ ও বিষাদ, যুগপৎ খেলা করে এই অনন্য অথচ চিরন্তন জীবনগাথার প্রতি ছত্রে। নিউ মেক্সিকোর এস্প্যানোলা উপত্যকায় পঁচিশ বছর কাটানো, লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অজস্র পরিচিত নারীর জীবন থেকেই উঠে আসা এই গল্পগুলি এক অর্থে, এই মহিলাদের সামগ্রিক শক্তি এবং বোধের এক অপূর্ব আলেখ্য। সোফিয়া, জুডিও-খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রজ্ঞা, যেন এই অজস্র নারীর জীবনবোধ ও সামগ্রিক উপলব্ধিরই এক সম্মিলিত রূপ। এই কবিতাগুলি তাই সেই নারীর, সেই নারীদের পায়ে উৎসর্গিত। বইয়ের উৎসর্গ পাতায় কবির নিজেরই ভাষায় বলা আছে নিম্নোক্ত কথাগুলি ...

জ্ঞানের দেবী সোফিয়াকে, যিনি রয়েছেন আমাদের সকলের বুকে।

আমার ঠাকুমা, লিথুয়ানিয়ার ইহুদি, সোফিকে, অতিথি সৎকারে সর্বদাই সাজানো তাঁর টেবিলকেও। আমার প্রথম মেয়ের নামের অংশ হয়ে বেঁচে আছেন তিনি।

স্পেনদেশ থেকে আগত, আমার পূর্বজ, পর্দানশীন সেই সোফিয়াকেও, হাজার বছর ধরে যিনি জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। আমারই লোকালয়ে তাঁর বাস, গোলাপ গাছের পরিচর্যা করতে করতে যিনি গল্প করেছেন আমার সাথে; যে শব্দের মাধুর্য, ঝরেছে বন্ধুর মত, কখনো উচ্চকিত স্বরে, কখনো নিশ্চুপ রাত্রে, শিশিরের মত। সঙ্কল্পে অটল, সেই সব মরমী শব্দ, আমায় দিয়ে গেছে, অজস্র কবিতা, দীর্ঘ, কালো রাত্রির গায়ে, অব্যক্ত নিরাশায়ও।

ভার্জিনিয়ার মধুর হাসিতে সাজানো, ঈশ্বর-সৃষ্ট সেই দেশে দেখা হয়েছিল আমাদের। সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিয়ে, কেটি-র সেই অনাবিল হাসিকে উৎসর্গ করি এই বই। ঠিক যে ভাবে সলাজ বধূর বেশে এসেছিল সে, দিয়েছিল কবিতা আমায়, প্রায় পনেরো বছর ধরে, সেই রূপটুকুই ধরতে চেয়েছি। এই গল্প সত্যসম, হয়ত সত্যের চেয়েও গাঢ়।

এই শব্দ আমি ফিরিয়ে দিতে এসেছি, সেই সব মহিলাকে, সেই সব অলীক হাওয়ার ভেসে যাওয়াকে, ভেসে থাকাকে। আমার না-জেনে-ওঠা ঠাকুমাকেও। আমি ওদের ছড়িয়ে দিলাম ওদেরই জীবনে আবার; ওদের স্প্যানিশ ভাষার কুজনে, ওদের রান্নাঘরে, ওদের প্রতিদিনের চর্চায়। সোফিয়া নামের এই ফুল ঝরে না কখনো তাই। ফুটে ফুটে ওঠে শুধু, চিরকাল, অনাদির বনে, আপন মনে। আমার ঠোঁট, আমার মুখ, আমার কথা বলা, ঘুমিয়ে পড়া নিশ্চিন্ত আরামে, সবটুকু আমি দিয়ে গেলাম সোফিয়ার পায়ে।

এই দ্বিভাষিক সংস্করণের জন্যে মূল ইংরেজি থেকে স্প্যানিশে অনুবাদ করেছেন ক্লেয়ার জয়স্মিথ এবং আরটুরো সেলিনাস। বইটি পাওয়া যাবে নিম্নক্ত ঠিকানায়

https://www.amazon.com/Sofia-Poems-Joan-Logghe/dp/1888809116

সোফিয়া সিরিজের কবিতা ও তার অনুবাদ

Sunset Draws Sofia Down

It was the most beautiful spring,
the spring she couldn't decide
if she were happiest or saddest.

It was the spring she wanted to run off
never see her children again
because she couldn't stand
that much love.

Her husband seemed to grow
up, then down, then sideways.
Nothing he did called her
in that old enticing way.

She had never seen such dimensions
in the clouds, layers so thick
she made time to admire them.

It was the season of morning walks
where the magpie and the woodpeckers flew
and jackrabbits leapt out of her way.

Some days she woke up a teenager
others, a grandmother.
She struggled between passion and despair
sadness that comes down
straight from the ancestors.

It was the long spring. The fragrant one.
Her children stepped to the side
when she passed.
Her husband stopped touching her.
The phone never rang.

She lived alone inside the family.
But the flowers she planted
grew with a force not common to the desert.

যেদিন সূর্যাস্ত ডেকে নিল সোফিয়াকে

সেটা ছিল, সোফিয়ার দেখা
সব চেয়ে সুন্দর ফাল্গুন মাস।
যে বসন্তে, বুঝে ওঠা কঠিন ছিল-
সোফিয়ার ভীষণ খুশী,
না দারুণ বিষাদ।

সেই বসন্তে ও পালাতে চেয়েছিল।
বিশেষত ওর বাচ্চাদের ফেলে;
কারণ, অত তীব্র ভালবাসা
অসহ্য লাগছিল ওর।

ওর স্বামী বেচারা
বেড়েই যাচ্ছিল শুধু;
দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে...
কিছুতেই আর আগের মত
লাগত না ওকে;
ও ডাকলে,আগের মত
তীব্র রোমাঞ্চে আর
কাঁপত না সোফি।
কি যেন পালটে গেল সেবার...

এর আগে, মেঘের এত রূপ,
কখনও দেখে নি ও।
থকথকে কালো মেঘ
আঙ্গুরের মত, সারা আকাশ জুড়ে-
দিনে রাত্রে, ঠিক সময় করে
দেখে নিত সোফি।

রোজ সকালে হাঁটতে যাওয়া;
কাঠ ঠোকরা আর শালিখের ওড়াউড়ি,
সাদা সাদা খরগোশ, লাফিয়ে,
পালিয়ে যেত, পায়ের পাশ কাটিয়ে...

এক একদিন কিশোরীর শরীরে জেগে ওঠা।
এক একদিন ঠাকুমার মত,
অসম্ভব জড়তায়।
তীব্র প্রেম আর চূড়ান্ত নৈরাশ্যের
মাঝখানে একলা সোফিয়া-
যেন কত শতাব্দীর
জড়ো-হওয়া বিষাদ।

দীর্ঘতম বসন্তও ছিল সেবার।
ফুলের গন্ধে ছেয়ে থাকত, সব সময়।
ছেলেমেয়েগুলো সরে যেত এক পাশে,
ওকে দেখলে।
স্বামী আর ছুঁত না ওকে;
ফোনও আর বাজত না বিশেষ।
সপরিবারে, একা একা
থাকতে শিখে গেল সোফি সেবার।

শুধু সেই মরুভুমিতে
ওর নিজের হাতে
পোঁতা গাছগুলো কিন্তু
বেড়ে উঠছিল এক বিরল আগ্রহে।

References

1. Joan Logghe official website: http://www.joanlogghe.com/
2. Publications of Joan Logghe: http://www.joanlogghe.com/publications.html
3. Sofia by Joan Logghe (1999): https://www.goodreads.com/book/show/473829.Sofia
4. Poems by Joan Logghe, available online
   a. Our Lady of Sorrows Fiesta: Small Things
   b. Rather, Unpunctuated awe
   c. Something Like Marriage
   d. Saint Patrick's Day on the Rez, To be happy

উদ্দালক ভরদ্বাজ – এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ গবেষনায় রত উদ্দালক অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাসবন্ধু, দুকূল, বাতায়ন, সংবাদ-বিচিত্রা, টেকটাচটক, বাংলাখরাব, স্বজন, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, ম্যাজিক-ল্যাম্প, স্বপ্নরাগ ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি দ্বারা প্রকাশিত বাংলার বাইরে বসবাসকারী লেখকদের কবিতা সংগ্রহ "কবিতা পরবাসে" এবং আন্তর্জাতিক বিজয়ওয়াড়া সাংস্কৃতিক সংস্থা এবং অমরাবতী দ্বারা প্রকাশিত আন্তর্জাতিক, বহুভাষী কবিতাসংগ্রহ, Poetic Prism-এও স্থান পেয়েছে উদ্দালকের কবিতা। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

রজত ভট্টাচার্য্য

২০৫০

জপের মালা এক চক্করও ঘোরানো হয়নি, তখনই থ্রিডি ফোনটা বেজে উঠল। উমা জায়গা থেকে না উঠেই বললেন "হ্যালো"। ভয়েস রেকগনিশন এক্টিভেট হতেই ঘরের মধ্যে একজন মহিলার ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে উঠল। বছর তিরিশের সুন্দরী, কফির কাপ হাতে টেবিলের সামনে বসে আছে। "সুপ্রভাত উমা"। সকাল বেলাতেই উমার মেজাজ গেল বিগড়ে। মেয়েটি মৃত্তিকা হাসান চৌধুরী। তার ছেলে কাজুর গার্লফ্রেন্ড। একসাথে থাকে। ছুঁড়ির এতবড় স্পর্ধা তাকে নাম ধরে ডাকে! এ কেমন শিক্ষা! মাসি, পিসি, কাকী, এত কিছু থাকতে দ্বিগুন বয়েসী আরেকজন কে নামধরে ডাকা! উমা মুখে জোর করে খানিকটা হাসি এনে বললেন "সুপ্রভাত, কেমন আছ ? কাজু কে দেখছিনা!" "কাজু ওয়াশ রুমে। এই ফিরলাম দুজনে। তোমার হেলথ মনিটর রেসপন্স করছেনা দেখে চিন্তা হল। তুমি আবার ওটা খুলে রেখেছ ?" উমা অল্প হেসে জবাব দিলেন "কি হবে আর হেলথ মনিটরে! এখন যেতে পারলে বাঁচি"। সারাক্ষণ কব্জিতে বেঁধে রাখা হেলথ মনিটর উমা কাল রাতে খুলে ফেলেছেন। তার শরীরের সমস্ত খুঁটিনাটি মায় তার রাগ, দুঃখ, ঘৃণা সব ওই যন্ত্রটা বুঝতে পারে। সামান্য এদিক ওদিক হলেই খবর যাবে তার ছেলের কাছে আর হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে। বছরে মোটা টাকা নেয় এই হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার। শারীরিক যে কোন রকম অসুবিধা, দুর্ঘটনা, যাই হোক না কেন পনের মিনিটের মধ্যে সাহায্য চলে আসবে। ডাক্তার, এয়ার এম্বুলেন্স, স্পেশালিস্ট ... সব কিছু। কিন্তু শর্ত ওই একটাই – চব্বিশ ঘন্টা হাতে মনিটর পরে থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের দায়িত্ব নেই। সত্তরোর্দ্ধ উমা এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ। রোগা পাতলা ছিমছাম চেহারা। ভবেশ মারা গেছেন প্রায় বছর পাঁচেক। তারপর থেকে তিনি একাই থাকেন। কাল সিরিয়ালে হঠাৎ পুরোনো মুসৌরির ক্লিপিংস দেখাচ্ছিল। উমা বেশ কয়েকবার মুসৌরি গেছেন। তিনি, ভবেশ আর কাজু। হঠাৎ ইচ্ছে হল পুরোনো ছবি গুলো দেখার। থ্রি ডি রিফ্লেক্টর তার সামনে জীবিত ভবেশ, কিশোর কাজু আর অনেক অনেক প্রাণবন্ত অন্য এক উমা কে এনে হাজির করল। খুব মনখারাপ হয় এই ছবিগুলো দেখলে। অথচ কি যে ভাল লাগে এই মনখারাপটা! দেহে-মনে কতদিনের হারিয়ে যাওয়া স্পর্শ, গন্ধ, ভাললাগা আবার ফিরে আসতে চায়। নিজের সাথে নিজের কথা, কতই না কথা, তার চেতনা কে ধীরে ধীরে আছন্ন করতে থাকে। এই ব্যথার যে কি সুখ তা কাজু বুঝবেনা। বুঝবেনা এই অনুভূতিগুলো কি চূড়ান্ত ব্যক্তিগত। কাউকে বলার নয়, বোঝানোর নয়। একটা যন্ত্র তার অনুভূতিগুলো বিশ্লেষণ করবে আবেগহীন দক্ষতায় আর তার ছেলেকে খবর পাঠাবে, এ তিনি ভাবতেই পারেন না। তিনি হেলথ মনিটরটা খুলে ফেলেছিলেন।

"মা তোমার শরীর ঠিক আছে? তুমি আবার কান্না-কাটি করছিলে না! তুমি মনিটরটা পর। এক্ষুনি!" কাজু তোয়ালে হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উমা হেসে বললেন "আমি ঠিক আছি। মনিটর পরবখন। তোরা কেমন আছিস ?" কাজু বিরক্ত মুখে বলল "আগে পর। তারপর অন্য কথা। কেন বোঝনা! এরপর সার্ভিস ডিসকানেক্ট করে দেবে। ওরা অলরেডি ওয়ার্নিং দিয়েছে।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উমা খাটের পাশে রাখা মনিটর হাতে পরে নিলেন। যন্ত্র একবার কেঁপে উঠে আবার থেমে গেল। উমা দেখলেন কাজু তার হাতের মোবাইলে তার মা'র বেঁচে থাকার সমস্ত তথ্য-প্রমাণ যাচাই করে দেখছে। কাজুর দীর্ঘশ্বাস উমা শুনতে পেলেন। "মা তুমি ওষুধ খাচ্ছ না, না ? কাল রাতে ঘুমোও নি! তুমি কি চাওনা সুস্থ থাকতে! এত করে বোঝালাম ..." উমা কাজুকে কথা শেষ করতে দিলেন না। "কাজু আমার কাজ আছে। গোপাল কে ভোগ দিতে হবে, আজ আবার পূর্ণিমা। পরে কথা হবে।" উমা ডান হাতে একটা ছোট্ট তুড়ি দিতেই থ্রী ডি প্রজেকশন বন্ধ হয়ে গেল।

বিরক্ত কাজু নতুন কেনা সুপার সাপল থ্রী ডি হ্যান্ডসেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। কতটা হতাশায় আর কতটা যন্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য বলা শক্ত। যন্ত্রটা কোঁচকানো, গোল্লা পাকানো কাগজের ডেলার মত দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে,

মাটিতে পড়ে রইল। বিজ্ঞাপনে এটা দিয়ে বল বানিয়ে লোকে ক্রিকেট খেলে। ভাঙার প্রশ্নই নেই। মৃত্তিকা কফির কাপে একটা হালকা চুমুক দিয়ে বলল "তোমার কথা ছিল আজ মা কে বলার ... বললে না। তোমার সমস্যা টা কি ? তোমার মা আমায় পছন্দ করবেন না ? কিন্তু কাজু, তুমি-আমি দুজনেই এটা বুঝি যে উনি আমাকে মোটেই পছন্দ করেন না, নতুন করে এই নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। নাকি দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছ। আমি তো বলেই রেখেছি আই এম ক্যাপাবল এনাফ টু বি এ সিঙ্গল প্যারেন্ট ..."।

কাজু টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে ঝাঁঝিয়ে উঠল "কি যা তা বকছ! মা এখন এমনিতেই ডিপ্রেসেড, তার ওপর নতুন করে ..." মৃত্তিকা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "কফি খাবে ? সাথে স্যান্ডউইচ ?" কাজুর কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে মৃত্তিকা আর কথা বাড়াল না। মৃত্তিকা একহাতে কফির কাপ আরেক হাতে স্যান্ডউইচ এর প্লেট নিয়ে ফিরে এসে দেখল কাজু টেবিলের ওপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছে। হালকা হাতে কাপ আর প্লেট টেবিলে নামিয়ে মৃত্তিকা কাজুর মাথায় হাত রাখল। আজ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এতটা না বললেও হত। মৃত্তিকার জন্ম এ দেশেই। তার নিজের দেশ সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট নয়। যে বিপুল প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা ভারত-বাংলাদেশ কে বিধ্বস্ত করেছে, তার সম্বন্ধে কাজুর মত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার নেই। কাজুর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মৃত্তিকা বলল "চল, দুজন মিলে একবার মা'র সাথে দেখা করে আসি। উনি যদি রাজি হন তাহলে ওনাকে এখানে নিয়ে আসব। দুজনে বললে উনি ঠিকই রাজি হবেন।" কাজু টেবিল থেকে মাথা না তুলেই বলল "তোমাকে নিয়ে কলকাতায়! তোমার কোনো ধারণা আছে ওখানকার কি অবস্থা? পুরো শহরটাই জলের তলায়। কোথাও ফুট খানেক তো কোথাও ছয়-সাত ফুট জল। শহরের বেশির ভাগ লোক হয় মারা গেছে নাহলে পালিয়ে বেঁচেছে। হভারক্রাফট ছাড়া আর কিছু চলেনা। যদি প্রটেকশন না নিয়ে যাও তাহলে অবধারিত ম্যালেরিয়া। এছাড়া চোর-ডাকাতের তো লেখা-জোখা নেই। মা যে কি করে টিকে আছে মা'ই জানে।" মৃত্তিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল "আমার যাওয়া দরকার কাজু, আমরা বোঝালে তোমার মা নিশ্চই বুঝবেন ...." কাজু মাথা তুলে মৃত্তিকার দিকে কিছুক্ষন চুপ করে তাকিয়ে থেকে মৃদু স্বরে বলল "তোমার যাওয়ার প্রশ্নই নেই। আমি একাই যাব। মা কে বোঝানো ...., তবে তুমি যখন বলছ ..., কিন্তু যাব বললেই তো হলোনা, অফিস থেকে ছুটি পাওয়া একটা বিরাট ঝামেলা, এন্টি প্যারাসাইট শট নিতে হবে, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের সার্টিফিকেট। বিরাট ঝামেলা। তারপর ফিরে এসে তিন দিন কোয়ারানটাইন ...। দেখি ..."

মৃত্তিকা একটি অতিবৃহৎ বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। হিউম্যান ইমিউন রেজিস্ট্যান্স নিয়ে ডক্টরেট করার পরে বেশ মোটা টাকার এই চাকরিটা সে পায়। বছর পাঁচেক আগে কলকাতা থেকে কতগুলো টিস্যু স্যাম্পল এসে পৌঁছয় তার হাতে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মৃত্যু হয়েছে অজানা জ্বরে। স্যাম্পলগুলো বেআইনি উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এগুলোর সম্বন্ধে আর কোনও তথ্যই সে পাই নি। বেশ কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা চালানোর পর মৃত্তিকা নিশ্চিত হল মৃত্যুর কারণ এমন কোনো জীবাণু যেটা আজ অবধি অচেনা। তথ্যটি অত্যন্ত গোপন রাখা হয় এবং এই পাঁচ বছর ধরে সে এবং আরও বেশ কয়েকটি টিম এর ওপর রিসার্চ চালাচ্ছে। শেষ দু বছরে বেশ কয়েক হাজার মানুষ এই জ্বরে মারা গেছে। এখনও অবধি তারা প্রতিষেধক বানাতে পারেনি। রোগের লক্ষণ হালকা জ্বর, সামান্য গায়ে ব্যথা, দিন দুয়েক এই ভাবে চলার পর হঠাৎ খিঁচুনি, শ্বাস কষ্ট এবং মৃত্যু। একবার শ্বাস কষ্ট শুরু হলে আর কিছু করার থাকেনা। মানুষের জানা কোন এন্টিবায়োটিক কাজ করেনা। পৃথিবী জুড়ে এই 'সুপারবাগ' তান্ডব চালাচ্ছে। এর বাহক হিসেবে মশা কে দায়ী করা হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক কান্ড এক নতুন প্রজাতির মশা কলকাতায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবত এই বিশেষ প্রজাতির মশাই এর প্রধান বাহক। বিশ্ব জুড়ে সমস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারকদের টনক নড়েছে। আজ অবধি একটি মানুষকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি যে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে প্রমাণিত অথচ শেষ অবধি বেঁচে গেছে। মৃত্তিকা জানে একজন, শুধু মাত্র একজনকেও যদি পাওয়া যায় যে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে গেছে, তাহলে তার সাফল্য নিশ্চিত। তার দেহরস থেকেই বানান সম্ভব প্রতিষেধক। তার ওপর কোম্পানির চাপ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই দৌড়ে তাকে প্রথম হতেই হবে, যে করে হোক। কোলকাতায় একবার যাওয়া খুব প্রয়োজন। ওখানকার হাসপাতাল গুলো একবার ঘুরে আসতে পারলে ফার্স্ট হ্যান্ড

এক্সপেরিয়েন্স হত। ওখানকার ডাক্তারদের সাথে কথা বলাটাও জরুরি। মৃত্তিকা কাজুর দিকে ফিরে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলল "আমি যাব। তুমি বাধা দিও না।"

চান করে বেরিয়ে উমা প্রতিদিন তুলসী গাছে জল দেন। তুলসী গাছটা একটা ছোট টবে বাইরে বসান। পোর্টেবল ইনসেক্ট রেপেলেন্ট চালু করে একহাতে নিয়ে আরেক হাতে ছোট পিতলের ঘটিতে জল ভরে উমা বারান্দার দরজার এয়ারলক খুললেন। উমার গোটা ফ্ল্যাটেই সমস্ত দরজা-জানালা এয়ারটাইট করে বন্ধ। সারাক্ষণই এয়ার পিউরিফায়ার, হিউমিডিফায়ার আর এয়ার সাপ্লায়ার চলছে। বাইরের হাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত। তাছাড়া মশার উপদ্রব। তাই এখানে এখন এটাই রেওয়াজ। কাজু বহু খরচা করে এই ব্যবস্থাটি চালু করেছে। প্রায় জনশূন্য কলকাতায় যারা এখনও টিকে আছে এবং যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তারা সবাই এই ভাবেই আছে। বেশির ভাগই বয়স্ক, আর যাওয়ার জায়গা নেই, অথবা উমার মতন কিছুতেই নিজের জায়গা ছাড়তে নারাজ। যাদের সেই সামর্থ্য নেই, তারাও আছে। তবে তাদের সংখ্যা বেশ কম। কিছু ভূমিহীন মানুষ, যাদের সর্বস্ব প্রকৃতির তাণ্ডবে শেষ হয়ে গেছে। বহুতল বাড়ির একদম উপরের দিকে খালি ফ্ল্যাট, ছাদ তারা দখল করে নিয়েছে। শুরুর দিকে সরকার থেকে হম্বিতম্বি করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু মরিয়া, হিংস্র, সংঘবদ্ধ মানুষের প্রতিরোধের সামনে সেই চেষ্টা দাঁড়াতে পারেনি। তাছাড়া কলকাতা একটা লস্ট কেস। নতুন রাজধানী দুর্গাপুর। নতুন সমস্যা, নতুন ভোটার, নতুন প্রতিশ্রুতির ভিড়ে পুরোন রাজধানীর সমস্যাগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। ইলেক্ট্রিক আর পরিশ্রুত জলের সাপ্লাই একদম শুরুতেই বন্ধ হয়ে গেছিল। সোলার ইলেক্ট্রিসিটি আর এয়ার ওয়াটার মেকার এখন একমাত্র ভরসা। উমার সবকটাই আছে। তাই সেদিক থেকে তার কোনো চিন্তা নেই। বারান্দার দরজাটা খুলতেই একটা পচা দুর্গন্ধ উমার নাকে এসে ধাক্কা মারল। গা গুলিয়ে উঠল উমার। বারান্দার রেলিংয়ের কাছে গিয়ে উঁকি মারতেই তিনি দেখতে পেলেন একটা মরা কুকুর কোথা থেকে ভাসতে ভাসতে তার বাড়ির সামনের পাঁচিলে এসে ঠেকেছে। মশার ঝাঁক কালো একটুকরো মেঘের মত হাত দশেক দূরে কুন্ডলী পাকিয়ে উড়ছে। তার হাতের যন্ত্রটি না থাকলে কি অবস্থা হত ভেবে উমা শিউরে উঠলেন। উমা খেয়াল করলেন কাকের দল কুকুরের মৃতদেহ টা ঘিরে উড়ছে, ডাকছে, কিন্তু তার কাছে যাচ্ছেনা। এক জোড়া কচ্ছপ সেটার দখল নিয়েছে। ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় দেখা বড়সড়, অতিমন্থর নিরীহ প্রাণী নয়। মাঝারি সাইজের হলুদ-কালো নকশা কাটা দ্রুতগামী ও অত্যন্ত হিংস্র একটি নতুন শংকর প্রজাতি। এরা ফুড চেনের একদম ওপরে আছে। এদের কাবু করার মত আর কোন প্রাণী নেই। এদের হাতে কুকুর, গরু, ছাগল তো বটেই মানুষ অবধি আক্রান্ত হচ্ছে। বড়লোক নগর বাসী এদের পূর্বপুরুষদের আমাজন অববাহিকা থেকে বেআইনি আমদানি করে একোয়ারিয়ামের শোভা বাড়াতেন, এখন স্থানীয় প্রজাতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এই বিচিত্র ও বিপদজনক প্রাণীটির উদ্ভব হয়েছে। উমা আর সহ্য করতে পারলেন না। কোনও রকমে গাছে জল ঢেলে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। এখন কিছুক্ষণ ইনসেক্ট রেপেলেন্ট টা চলবে। বলা যায় না ঘরে মশা ঢুকে গিয়ে থাকতে পারে। কচ্ছপের মত মশারও একটি নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। উমার ছোটবেলায় দেখা কালো, স্বাস্থ্যবান মশা নয়, যেগুলো এক থাপ্পড়ে সাবাড় হত আর হাতে কালো-সাদা ডোরা কাটা দাগ পড়ে যেত। সেই মশা আজ আর দেখা যায় না। খুব ছোট, কালোর ওপর সাদা ছোপ ছোপ এই মশাগুলো অত্যন্ত দ্রুত উড়তে পারে। খালি চোখে এদের দেখতে পাওয়া খুব শক্ত। এরাই এক নতুন ধরনের জ্বরের জীবাণু বাহক। মিডিয়া জীবাণুর নাম দিয়েছে 'সুপার বাগ'। দিন তিনেকের জ্বর। কিছু বোঝার আগেই রুগী সমস্ত চিকিৎসার আওতার বাইরে চলে যাবে।

দিব্যি সংসার করছিলেন উমা। ভবেশ রিটায়ার করে বাড়িতেই বসা। আর্থিক সমস্যা নেই। দুজনেই সুস্থ। পেনশনের টাকা জমিয়ে দিব্যি দুজনে ইউরোপ ঘুরে এলেন। কাজু চাকরি নিয়ে বিদেশে। ওর জন্য মেয়ে দেখা শুরু করেছেন ভবেশ। কাজুর এতে মত নেই – তাই নিয়ে বাপ-ব্যাটায় মান-অভিমানের পর্ব চলছে। একটা সুখী সংসারে যে সমস্যা গুলো থাকে আর কি! একদিন টিভি তে বলল একটা ঝড় আসছে। এমন ঝড় নাকি আজ অবধি কেউ দেখেনি। বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্টি হয়ে সে সব তছনছ করে দিতে বাংলায় ঢুকবে দিন দুয়েকের মধ্যে। সরকারী লোকজন মাইকে প্রচার শুরু করে দিল, টিভি খুললেই তুমুল আলোচনা। ভবেশ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে টুকটাক বাজার করে আনলেন। মোমবাতির পাট অনেকদিন চুকে

গিয়েছিল, তাই ডজন খানেক। কিছু সব্জি, মাছ, ডিম এই সব। দিন কয়েক বাড়ি থেকে না বেরোলে যাতে কোন সমস্যা না হয়। ভবেশ কাজু কে ফোন করে জানালেন চিন্তা না করতে। তারপর তিনি আর উমা অপেক্ষা করতে লাগলেন ঝড়ের জন্য। ঝড় এলো নির্ঘন্ট মেনে। তিনশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় সে আছড়ে পড়ল ভূখণ্ডে। সাথে তীব্র বৃষ্টি। দিন দুয়েক তান্ডব চালানোর পরে ঝড় থেমে গেল। বৃষ্টি চলল আরো দিন তিনেক। তার পরের কথা উমা আর ভাবতে চাননা। অগুনতি মৃতদেহ – মানুষ, পশু, পাখি একসাথে ভেসে যাচ্ছে। পাকা বাড়ি দুমড়ে পড়ে রয়েছে। একটা গাছও দাঁড়িয়ে নেই। মোবাইল টাওয়ার ভেঙে পড়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে পাশের বহুতল। রাস্তায় উল্টে পড়ে রয়েছে আধডোবা বাস। ছোট গাড়ির অবয়ব জলের তলায় হালকা বোঝা যাচ্ছে। ঘোলা জল পাক খেতে খেতে বয়ে চলেছে রাজপথ দিয়ে, সাথে বয়ে নিয়ে চলেছে অজস্র শবদেহ, ভাঙা দোকান, উপড়ানো গাছ, আরও কত কি ! ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই উমার ফ্ল্যাটের বেশ কয়েকটা জানলার পাল্লা ভেঙে গিয়েছিল। বারান্দার দরজাটা কিছুক্ষণ আস্ত ছিল, তারপর বিকট শব্দ করে প্রথমে ছিটকিনি টা উপড়ে গেল, তারপর পাল্লা শুদ্ধু বাকি দরজাটা। মোমবাতি, খাবার, কোনো কিছুই বিশেষ কাজে লাগেনি। উমা আর ভবেশ জবুথবু হয়ে একটা খাটের উপর বসেছিলেন এই দু দিন। সমস্ত ঘর জলে থই থই। একটা আসবাবও সোজা নেই। শখের ওয়াল হ্যাংগিং গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেমন তেমন হয়ে পড়ে রয়েছে ঘর জুড়ে। দু দিন শুধু বিস্কুট আর জল খেয়ে ছিলেন তারা। ঝড় থামলেও তীব্র বৃষ্টির দাপটে বাড়ি থেকে বেরোনো যায়নি। ত্রাণ এলো প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে। মোবাইল যোগাযোগ চালু হলো তারও পরে। কাজু মরিয়ার মত আসার চেষ্টা করছিল। ভবেশ অতি কষ্টে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে থামালেন। দিন দশেক পরে উমার বারণ সত্ত্বেও ভবেশ বাইরে বেরোলেন। ফিরে এলেন আধ ঘন্টা পর। গায়ের পাঞ্জাবিটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেছে। নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে অঝোর ধারে। গলির মুখে পৌঁছনোর সাথে সাথেই একদল লোক তার মানিব্যাগ, মোবাইল সমস্ত কেড়ে নিয়েছে। আটকাতে গিয়ে এই অবস্থা। পাড়ার লোক রাস্তায় ছিল। কেউ কোন কথা বলেনি। উত্তেজিত উমা থানায় ফোন করেছিলেন। কেউ ফোন তোলেনি। তার পরের দিন সিঁড়িতে শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দেখলেন পাশের বাড়ির বিশ্বাস'রা ব্যাগপত্র নিয়ে বেরোচ্ছে। বিশ্বাস'দের কাছ থেকেই জানা গেল পাড়া প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই পালাচ্ছে। ভবেশ কারণ জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পেলেন না। কারণ জানা গেল একটু পরেই কাজু'র ফোনে। আবার ঝড় আসছে। দিন চারেকের মধ্যেই। অস্থিরতা এড়ানোর জন্য সরকার থেকে খবর চেপে রাখা হয়েছে। ভবেশ আর উমা বিস্তর ভেবেও এমন কোনো জায়গা পেলেন না যেখানে তারা যেতে পারেন। আত্মীয়-পরিজন সবাই কলকাতাবাসী। তাদের অবস্থা এর থেকে ভালো কিছু হবে এটা ভাবা ঠিক হবে না। কাজু'র কাছে যাওয়া যাবে না কারণ কলকাতা এয়ারপোর্ট সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। হাওড়া-শিয়ালদা তে মিলিটারি দের জন্য অতিকষ্টে এক আধটা ট্রেন চালানো হচ্ছে। ভবেশ আর উমা ঠিক করলেন তারা এখানেই থাকবেন। বাড়িতে খাবার যা আছে মাস খানেক চলবে। খাবার জল যতটা সম্ভব মজুত করে দুজন মিলে তৈরি হলেন প্রকৃতির রোষের মোকাবিলা করার জন্য। তিনদিন পর থেকে বৃষ্টি শুরু হলো। তীব্র, বিরামহীন, চরাচর অন্ধকার করা বৃষ্টি। চারদিন এই ভাবে চলার পর বৃষ্টি থামল। বিস্মিত উমা দেখলেন তার তিনতলার ফ্ল্যাটের বারান্দা অবধি জল উঠে এসেছে। কলকাতা এই মার সহ্য করতে পারেনি। মহানগরী দ্রুত মহাশ্মশানে রূপান্তরিত হল। এই ঝড় আর অতিবৃষ্টি কিন্তু চলতেই থাকল। বছর খানেক এই অসম যুদ্ধে কোনোরকমে টিকে থাকার পরে তারা সুখবর টি পেলেন। বাবা-মা কে কাজু নিয়ে আসতে পারবে। ও দেশের সরকার অনুমতি দিয়েছে। প্রথম চোটে বছর খানেকের জন্য। ভবেশ আর উমা তখন মুক্তির আনন্দে আত্মহারা। কাজু আগে থেকে এজেন্সি ঠিক করে রেখেছিল। সে এসেই বাবা-মা কে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। নতুন এয়ারপোর্ট হয়েছে খড়গপুরে। এজেন্সি দায়িত্ব নিয়ে তিনজনকে খড়গপুরে পৌঁছে দেবে। বুধে আসবে কাজু, প্যাকিং শেষ হয়ে গেছে রবিবারেই। সোমবার সকাল থেকে ভবেশের জ্বর এল। কিছুই নয়, শরীর হালকা গরম, মাথাটা অল্প ধরে রয়েছে। কাজু বুধবারে যখন বাড়ি ঢুকল, তখন ভবেশ মারা গেছেন। উমা বাড়ি ছেড়ে যাননি। কাজুর অনুনয়, রাগারাগি, অভিমান কোন কিছুই তাকে টলাতে পারেনি। কাজু ফিরে গেছে নিজের কাজের জায়গায়। সেখান থেকেই যতদূর সম্ভব এই ফ্ল্যাটটাকে একটা দূর্গ বানাবার চেষ্টা করেছে।

উমা ঘরে ঢুকে সবে পুজো শুরু করেছেন ইন্টারকমে কথা ভেসে এল "মাসি কি শুনতাসেন ? আমি পরী আইসি।" পরীরা এ বাড়ির ছাদ দখল করে আছে। জনা পাঁচেকের সংসার। এই মেয়েটার সাথে উমার খুব ভাব। বাংলাদেশের

বরিশালে বাড়ি ছিল। এখন আর কিছুই নেই। কোনোরকমে এখানে মাথা গুঁজেছে। উমা দরজার এয়ার লক খুলতেই পরী হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। বছর কুড়ির যুবতী যার চেহারায় অপুষ্টির পাকা সীলমোহর। তার বাঁহাতে একটা প্লাস্টিকের বোতল, ডান হাত পিছনে লুকোনো। একগাল হেসে পরী তার ডান হাতটা তুলে উমা কে দেখাল। একটা ছোট্ট লাউ, তার সদ্য কাটা বোঁটা থেকে তখনও রস ঝরছে। "তোমার জন্য লইয়া আইলাম, দুইটা হইসিলো, একটা আমাগো আর একটা তুমি রাইন্ধা খাইও।" উমা সস্নেহে পরীর মাথায় হাত রাখলেন। "দে, কি সুন্দর দেখতে রে ! আহা, ছিঁড়লি কেন ?" পরী হেসে গড়িয়ে পড়ে জবাব দিল "অ আল্লা, খামু না ত কি! দ্যাখলে তো আর পেট ভরতো না।" উমা পরীর হাত থেকে প্লাস্টিকের বোতলটা নিয়ে এয়ার ওয়াটার মেকারের নিচে রেখে কলটা চালু করে দিলেন। সারাদিনে প্রায় দেড়শ লিটার জল তৈরি হয় যন্ত্রটাতে। উমা নিজের প্রয়োজন মত রেখে বাকিটা পরীকে দিয়ে দেন। পরী প্রতিদিন এসে জল নিয়ে যায়। পরীরা ছাদের দখল নিয়েছে বছর খানেক। পরী, তার বোন দুরী, তাদের দুই ছেলে হানিফ আর হাসান আর একজন গ্রাম সম্পর্কের বৃদ্ধ চাচা কেরামত। পরী আর দুরী দুজনেরই স্বামী মারা গেছে অজানা জ্বরে। উমা অবাক হয়ে ভাবেন এই তো সেদিন এলো ওরা, এর মধ্যেই ছাদে বাগান করে তাতে আবার ফসল ফলাতে শুরু করেছে! কি করে এরা এত সাহস, এত উৎসাহ, এত উদ্যম পায় কে জানে। দুই বোন দু বাড়িতে আয়ার কাজ করে। আজকাল শহরের মধ্যে দিব্যি ভুটভুটি চলে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখ অবধি যাওয়াই সবচেয়ে বড় সমস্যা। হিংস্র কচ্ছপ আছে, সাপ আছে আর আছে লক্ষ লক্ষ মশা। উমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তোরা বাইরে যাস কি করে ? ভয় করে না ?" পরী হেসে জবাব দিয়েছিল "না বাইরোইলে খামু কি? সারা শরীলে মশা মারার ওষুধ মাইখ্যা বাইরই। দুইজনের হাতে দুই খান কোচ থাকে। কোচ বুঝেন তো? এই ধরেন চার হাত লাম্বা বাঁশের আগায় তিনডা-চাইড্ডা লোহার পেরেক বয়ায়ে দিসে। হেইডা দিয়া খুচা দিওন মানে লোহার পেরেক গিয়া এক্কেরে বিন্ধা যাইত। আপনেরে আমি দেহামু অনে। কেরামত চাচা আমার আর দুরীর জইন্য একটা কইরা বানায়ে দিসে। হালার কাউঠায় আইসল কয় বার। এমন বাড়ি দিসি যে ...." উমা চুপ করে ছিলেন। এই সাহস আর বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা তাকে মুগ্ধ করে। নিজেও যেন বেঁচে থাকার রসদ পান। ভর্তি বোতল পরীর হাতে তুলে দিয়ে উমা বললেন "ওবেলা একবার আসিস। একটু পায়েস বানিয়েছি গোপাল কে ভোগ দেব বলে। হারুন আর হাসানের জন্য নিয়ে যাস।" পরী হেসে বলল "আমু হনে।"

ফ্লাইট এটেনড্যানটের কাছ থেকে সন্তর্পণে কফির কাপটা নিয়ে হোল্ডারে রেখে কাজু বলল "তোমার ওখানকার কন্টাক্টস ঠিক জানে তো ? হাসপাতালে তোমায় ঢুকতে দেবে ?" মৃত্তিকা একটু হেসে বলল "চিন্তা কোরোনা, ওরা ঠিক ম্যানেজ করবে। কাজু তোমায় একটা কথা বলা হয়নি। আমি আসার আগে একটা চেক আপ করিয়েছি। সব ঠিক আছে। আমাদের কিন্তু মেয়ে হবে।" কাজু কফির কাপে সবে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেয়ে আবার কাপ টা নামিয়ে রাখল, তারপর একগাল হেসে বলল "আমি জানতাম।" মৃত্তিকা অল্প হেসে বলল "কি করে জানলে ?" কাজু মৃত্তিকার হাত চেপে ধরে বলল "আই প্রেড। আমি তো নাম অবধি ভেবে রেখেছি। আমাদের মেয়ের নাম হবে ধরিত্রী।"

এজেন্সির লোক গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে অপেক্ষা করছিল। একটি বছর পঁচিশের মেয়ে আর জনা চারেক সিকিউরিটি গার্ড। কাজু অবাক হয়ে দেখল এরা প্রত্যেকে সশস্ত্র। মেয়েটির কোমরেও আগ্নেয়াস্ত্র। বাকিরা তাদের মালপত্র গাড়িতে যখন তুলছে অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে মেয়েটি মৃত্তিকার দিকে হেসে বলল "ম্যাম, আমি প্রীতি। আপনাদের সাথে এই গাড়িটাতে যাব। ওরা পিছনে আসবে। আমি সামনে বসলে আশাকরি অসুবিধা হবে না ?" মৃত্তিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। NH-6 ধরে খানিকটা যাওয়ার পর কাজু জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা, আপনারা প্রত্যেকে আর্মড, কেন বলুন তো ? আপনারা কি বিপদের আশঙ্কা করছেন ?" মেয়েটি ঘাড় না ঘুরিয়েই জবাব দিল "স্যার, আপনারা যে অঞ্চলটায় যাচ্ছেন, সেটা ডিসটার্বড এরিয়া। রিসেন্টলি বেশ কিছু অর্গানাইজড ক্রাইম রিপোর্টেড হয়েছে। তাই প্রিপেয়ারড থাকাই ভাল। তবে চিন্তা করবেন না। আমাদের কন্টাক্টস আছে, তারা খেয়াল রাখবে।" মৃত্তিকা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, এবার জিজ্ঞাসা করল "অর্গানাইজড ক্রাইম, আপনাদের কন্টাক্টস, ঠিক বুঝলাম না। ওখানে পুলিশ নেই ? ল এন্ড অর্ডার কে মেইনটেইন করে?" প্রীতি এবার ঘাড় ঘুরিয়ে মৃত্তিকার দিকে দেখল, তারপর চোখের ওপর নেমে আসা চুল গুলো আলতো

করে সরিয়ে খুব কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল "থানা, কোর্ট, আর যা কিছুর কথা আপনি ভাবছেন, সব জলে তলিয়ে গেছে। নামেই ওটা আমাদের দেশ, ম্যাম। ওখানে বেঁচে থাকতে গেলে ওখানকার নিয়ম মেনে থাকতে হয়।....." প্রীতি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই তার ফোন বেজে উঠল। হুঁ, হাঁ ইত্যাদি কয়েকবার করে সে ড্রাইভার কে সংক্ষেপে কিছু নির্দেশ দিল। গাড়ির গতি একটু স্লো করে ড্রাইভার পিছনের গাড়িটিকে আগে আসার সুযোগ করে দিল। পিছনের গাড়িটি ওভারটেক করে সামনে এল আর দুটো গাড়িই আগের থেকে গতি কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট দুরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকল। কাজু আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল "এনি প্রবলেম ?" প্রীতি বলল "বিশেষ কিছু না, সামনে একটা রোড ব্লক আছে, ওরা আমাদের কিছু বলবে না। সব আগে থেকে সেট করা আছে।" মিনিট দশেক এই ভাবে চলার পর কাজু দেখল রাস্তা সরু হয়ে এসেছে। রাস্তার দুপাশে প্লাস্টিক আর টিনের ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি। নগ্ন ও অর্ধনগ্ন বাচ্চারা রাস্তায় খেলে বেড়াচ্ছে। রুগ্ন, হাড় জিরজিরে চেহারার প্রচুর মানুষ বসে রয়েছে রাস্তার ধারে। গাড়ির গতি আরও কমে গেছে। দুটি গাড়ির মধ্যের দূরত্ব এখন মাত্র কয়েক হাত। ক্রমাগত তীব্র স্বরে হর্ণ বাজাতে বাজাতে দুটি গাড়ি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। হঠাৎ সামনের গাড়িটি থেমে গেল। কাজুদের গাড়ি তার থেকে হাত খানেক পিছনে এসে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে দুটো গাড়িকেই ঘিরে ফেলল কয়েকশ লোক। অর্ধনগ্ন, শীর্ণকায়, হিংস্র একদল মানুষ। প্রথমে হাত দিয়ে গাড়ি পেটানো শুরু হল। কয়েক শ' হাত ক্রমাগত গাড়িতে আঘাত করছে। মৃত্তিকার আর্তনাদ শুনে কাজু সভয়ে দেখল একজন একটা ইঁট তুলে নিয়ে ক্রমাগত জানলার কাঁচে আঘাত করছে। প্রীতি ঠান্ডা স্বরে বলল "ডোন্ট ওরি, ওটা হাই স্ট্রেন্থ গ্লাস, ভাঙবে না।" তারপর হঠাৎ মানুষ গুলো পালাতে শুরু করল। আরেক দল লোক এসেছে। এদের হাতে লাঠি, লোহার রড। এলোপাথাড়ি মারতে মারতে এরা দ্রুত রাস্তা খালি করে দিল। সামনের গাড়ি চালু হবার সাথে সাথে কাজুদের গাড়িও স্টার্ট নিল। রাস্তায় পড়ে থাকা কতকগুলো পাথর আর গাছের ডাল কে পাস কাটিয়ে তাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। কাজু এতক্ষণে খেয়াল করল মৃত্তিকা দু'হাতে মুখ ঢেকে সিটের ওপর পা গুটিয়ে বসে আছে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। কাজু মৃত্তিকার কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল "আর ভয় নেই, দ্যাখ, ওরা আর নেই।"

কলকাতায় ঢোকার একটু আগে গাড়ি দুটো থেমে গেল। এই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। রাস্তার দুধারে জলা জমি বড় বড় ঘাস আর উলুখাগড়ায় ঢাকা। তারই মধ্যে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে বিরাট বিরাট বাড়ি। তাদের কার্নিশে বটগাছ এই ক'বছরেই নিজের আধিপত্য কায়েম করেছে। জন প্রাণীর সারা নেই। নিজের ফোনে কার সাথে যেন কথা বলে প্রীতি গাড়ি থেকে নামল। আরেকটি গাড়ি থেকেও সিকিউরিটি গার্ড রা নেমে এসেছে। নিজেদের মধ্যে খানিক্ষণ কথা বলার পর প্রীতি গাড়ির দরজা খুলে মৃত্তিকা কে বলল "ম্যাম, কাইন্ডলি নেমে আসুন। কোন ভয় নেই। স্যার প্লিজ ..." কাজু গাড়ি থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞাসা করল "কোথায় এলাম ?" প্রীতি নিজের রিস্ট ওয়াচ এর দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ না তুলেই বলল "এই জায়গাটার আগের নাম ছিল শলপ। এখান থেকেই হভারক্রাফট চড়তে হবে স্যার। আমরা এয়ার লিফটিং এর চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারমিশন পাইনি। ব্রিজ দিয়ে যাওয়া যাবে না। খুবই খারাপ কন্ডিশন। চিন্তা করবেন না। সব ঠিক আছে। আমাদের একটু হাঁটতে হবে। মিনিট পাঁচেক। খোলা জায়গায় এ জিনিস রাখলে সরকারী ঝামেলা প্রচুর। তাই একটু আড়ালে রাখা আছে। লাগেজ ওরা নিয়ে আসবে। আপনারা আমার সাথে আসুন।" প্রীতি দু'জন সিকিউরিটি গার্ডের দিকে ইঙ্গিত করতেই তারা গাড়ি থেকে মাল নামাতে শুরু করল। কাজু মৃত্তিকার হাত ধরে প্রীতির পিছনে হাঁটতে আরম্ভ করল। পিছনে দুজন সিকিউরিটি গার্ড ইনসেক্ট রেপেলেন্ট হাতে নিয়ে আসছে। পায়েচলা রাস্তা ক্রমাগত ঢালু হয়ে উলুখাগড়ার জঙ্গলের ভিতর ঢুকল। পায়ের তলার মাটি নরম আর পা দিলেই শব্দ করে জল আর কাদা ছিটকে আসছে। সরু পথে দুজন পাশাপাশি হাঁটা যায়না। কাজুর পিছনে মৃত্তিকা তার কাঁধ খামচে ধরে হাঁটছে। খানিকদূর গিয়ে একটা কাঠের পাটাতন পাতা ঢিবির মত উঁচু জায়গায় উঠতেই তাদের চোখে পড়ল হভারক্রাফটটা। কালো একটা প্লাস্টিকের ছাউনি বানানো হয়েছে সেটার ওপর। একজন লুঙ্গি পরা রোগা চেহারার লোক প্রায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে প্রীতির সামনে এসে দাঁড়াল। প্রীতি কোনো কথা না বলে একটা নোটের তাড়া তার হাতে ধরিয়ে দিল। লোকটিও বাক্যব্যয় না করে বেশ সময় নিয়ে টাকাটা গুনল। তারপর সে পথ ছেড়ে দাঁড়াতেই হভারক্রাফটের ছাউনির ভিতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। দুজন

মিলে ধরাধরি করে একটা পাটাতন হভারক্রাফট থেকে ঢিবি অবধি বসিয়ে দিল। প্রীতি মৃত্তিকার দিকে তাকিয়ে বলল "চলে আসুন ম্যাম। স্যার ...." তার বাড়ানো হাত অগ্রাহ্য করে কাজু পাটাতন দিয়ে হেঁটে গিয়ে হভারক্রাফটে উঠে মৃত্তিকার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল "চলে এস, সাবধানে।" কালো প্লাস্টিকের ছাউনির তলায় দুটো বেঞ্চি দড়ি দিয়ে ক্রাফটের গায়ের সাথে বাঁধা রয়েছে। মালপত্র নিয়ে বাকি চারজন উঠতেই পাটাতন সরিয়ে নেওয়া হল আর প্রচন্ড শব্দ করে, চারিদিকে আলোড়ন তুলে হভারক্রাফট চালু হল। পাকা রাস্তায় না উঠে হভারক্রাফট ডান দিকে ঘুরে সোজা চলতে আরম্ভ করল। ছাউনির চার দিকে চারজন সিকিউরিটি গার্ড তাদের অস্ত্র উঁচিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডুবে থাকা বাড়ির ছাদ, মরা গাছের জেগে থাকা ডাল, স্তূপাকৃত ভাসমান আবর্জনা, মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিঙের ভেঙে পড়া কঙ্কাল – পথে দৃশ্য একই, অপরিবর্তিত। ঘন্টা খানেক একই ভাবে চলার পর প্রীতি ছাউনির ভিতরে মুখ বাড়িয়ে বলল "আমরা এখন গঙ্গার ওপর আছি ম্যাম, আর আধ ঘন্টার ভেতরে বাড়ি পৌঁছে যাবেন।" কাজু মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কচুরিপানা আর আবর্জনায় পূর্ণ একটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে হভারক্রাফট চলেছে। তীব্র হাওয়ায় ছিটকে উঠছে সবুজ, পঙ্কিল জল। প্রবাহহীন, মৃত সরীসৃপের মত পড়ে রয়েছে কলকাতার লাইফ লাইন। কাজু আর্তনাদ করে উঠল "কি করে হল ? কবে থেকে ...." প্রীতি অবাক গলায় বলল "জানেন না! বছর তিনেক হবে, বেনারস, পাটনায় আর মালদায় নতুন রিজার্ভর তৈরী করে জল বাঁচান হচ্ছে। কলকাতায় আর কেউ থাকেনা, আসেনা, তাই সরকার থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলের যা ক্রাইসিস, নষ্ট করার কথা ভাবা যায় না।" মৃত্তিকা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল এবার প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলল "আপনি ভিতরে আসুন।" প্রীতি ভিতরে এসে বসলে মৃত্তিকা হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা চকলেট বার করে প্রীতি কে দিল, নিজে একটা নিল। চকলেটে একটা হালকা কামড় দিয়ে মৃত্তিকা বলল "ওই লোকগুলো কারা ? আমাদের গাড়ি ঘিরে ধরে ছিল কেন ?" প্রীতি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল "দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় সবকটা গ্রাম জলের তলায়। সমুদ্র এগিয়ে এসেছে অনেকটা। যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিল তাদের সরকার থেকে নানান জায়গায় শিবির বানিয়ে রেখে দিয়েছে। নামেই শিবির, না আছে খাদ্য, না আছে জল, না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই। রাস্তায় গাড়ি দেখলেই ওরা লুটপাট করার চেষ্টা চালায়।" "আর ওই লোকগুলো কারা, যারা মারপিট করল ?" কাজু জিজ্ঞাসা করল। প্রীতি মৃদু হেসে বলল "প্রত্যেক এলাকার একজন করে শাসক আছে স্যার। সরকারী শাসক নয়। সরকারী লোকেরা এখানে আসতে সাহস পায় না। এরাই আমাদের কন্টাক্টস। বুঝতেই পারছেন, আমাদের সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। কন্টাক্টস না থাকলে আপনাদের নিয়ে ওখান থেকে বেঁচে বেরোতে পারতাম না।"

ফ্রোজেন ফুড এন্ড গ্রোসারিজ থেকে তিন মাসের জিনিস একসাথে দিতে এসেছে। উমা ছেলেটিকে চেনেন। কোম্পানি থেকে আগেই ফোন করে বলে দেয় কে আসবে আর কখন আসবে। মোবাইলে তার নাম, ছবি আগেই চলে আসে। উমা আজকাল চেনা মুখ ছাড়া দরজা খোলেন না। বেশির ভাগই রেডিমেড খাবার। ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, রুটি। বিশেষ ভাবে প্যাকেট করা এই খাবার গুলো অনেকদিন থাকে। স্বাদ চলনসই। অল্প মাছ আর চিকেন কাঁচা। যদি কখন স্বাদ বদলাতে ইচ্ছে হয়। উমার নিজের জন্য রান্না করতে আর ভাল লাগেনা। তার চেয়ে এই ভাল। মাইক্রোওয়েভ করে নিলেই হল। এছাড়া সামান্য কিছু মসলাপাতি, টুক টাক দু একটা জিনিস, তার বেশি উমার প্রয়োজন নেই। ছেলেটিকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে জিনিসপত্রের হিসেব বুঝে নিতে নিতে অন্যমনস্ক ভাবে উমা শুনলেন সিঁড়িতে কাদের যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছেন। বেশ কয়েকজনের পায়ের শব্দ আর আর তারা তার ফ্ল্যাটের দিকেই আসছে। উমার বুকের ভিতর ধক করে উঠল। ছেলেটিও পায়ের শব্দ শুনেছে। অসময়ে অনেকের আসা আজকের দিনে একটি বার্তাই বহন করে – ডাকাত পড়েছে। উমা দেখলেন মাল দিতে আসা ছেলেটার চোখ বিস্ফারিত, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কত বয়স হবে ছেলেটার ? ষোল, সতের, মেরেকেটে আঠারো। উমা ছেলেটির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকালেন তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এয়ার লক নিজে থেকে চালু হয়ে গেল। ভয়ে তখন তার হাত-পা কাঁপছে। ছেলেটি এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার বলে উঠল "মাসীমা, এখন কি করব ?" উমাও একই কথা ভাবছিলেন। সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নতুন করে অনুভব করলেন কি দারুন অসহায় তিনি। উচ্চস্বরে কলিং বেল বেজে উঠল, একবার, দুবার, তিন বার। তারপর বার দুয়েক দরজায় টোকা।

উমা আর সহ্য করতে পারলেন না। কোনরকমে সোফার ওপর বসে পড়লেন। থ্রী ডি ফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। অভ্যাস মতই তিনি বলে ফেললেন "হ্যালো!" ভয়েস এক্টিভেশন চালু হতেই ক্রমাগত তীব্র হতে থাকা হৃৎস্পন্দনের শব্দের সাথে শুনতে পেলেন "মা, দরজা খোল, আমি কাজু।"

বহুদিন পরে উমার ফ্ল্যাট আজ গমগম করছে। গোলমাল শুনে পরী আর দুরী নীচে নেমে এসেছিল হাতে কোচ নিয়ে। প্রীতির হোলস্টার থেকে পিস্তল বার করা আর পরীর কোচ ছুঁড়তে যাবার ঠিক আগেই উমা দরজা খোলেন। প্রাথমিক বিস্ময়, বাঁধ ভাঙা উচ্ছাস আর আলিঙ্গন শেষ হলে প্রীতি মৃত্তিকাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলল "ম্যাম, আমার কাজ শেষ। কাইন্ডলি পারমিশন দিন। আমায় ফিরতে হবে। রাত হয়ে এসেছে। বাকি ছেলেগুলোও ফিরবে। তাই ...." মৃত্তিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল "এজেন্সির সাথে আমাদের কন্ট্রাক্ট আছে চার দিনের। কাল সকালে আমায় বেরোতে হবে। কলকাতার কতগুলো হাসপাতালে ভিসিট করতে হবে। কালকেও আমার এসকর্ট লাগবে। তোমায় আমার ভাল লেগেছে। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি কনফিডেন্ট ফিল করব। ক্যান যু এরেঞ্জ দ্যাট ?" প্রীতি হেসে বলল "নো প্রবলেম, আমি কথা বলে নিচ্ছি। এই টিমই থাকবে। কাল কটার সময় আসব ম্যাম ?" উমা চা করতে যাচ্ছিলেন রান্নাঘরে, দাঁড়িয়ে পরে বললেন "সেকি! এখন কোথায় যাবে ? রাত হয়ে গেছে। এমনিই বিপদের শেষ নেই তার ওপর তুমি একা মেয়ে। না না, কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, এখানেই থেকে যাও। আমার ফ্ল্যাটে জায়গার অভাব নেই।" প্রীতি হেসে ফেলে কিছু বলতে যাবার আগেই মৃত্তিকা বলল "ঠিক, আজ তুমি এখানেই থেকে যাও। কোথাও যাবার দরকার নেই। কাল একসাথে বেরোব। তুমি বরঞ্চ বাকি টিম কে বলে দাও সকাল আটটার সময় রিপোর্ট করতে।" বিস্মিত প্রীতি আরও কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তাকে সুযোগ না দিয়ে মৃত্তিকা বলল "তাছাড়া তোমার এজেন্সির আমায় চব্বিশ ঘন্টা প্রটেকশন দেওয়ার কথা। এখন তোমার জন্য কেউ যদি অপেক্ষা করে থাকে তা হলে আলাদা কথা।" প্রীতি মুখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল "কেউ অপেক্ষা করে নেই। ঠিক আছে ম্যাম, আমি টীম কে বলে দিচ্ছি।"

সন্ধ্যে হতে না হতেই হারুন আর হাসান হাজির। সাথে তাদের মা'রাও এসেছে। পরী আর দুরী কাঁচু মাচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। উমা তাদের হাত ধরে এনে সোফায় বসালেন। খুশিতে উদ্বেল উমা ওদের রাতে খেয়ে যেতে বলে সোজা রান্না ঘরে ঢুকে গেলেন। মৃত্তিকা সাহায্য করতে গিয়েছিল কিন্তু উমা ছেলেমানুষের মত উচ্ছসিত হয়ে বললেন আজ উনিই রাঁধবেন। কথা না বাড়িয়ে মৃত্তিকা ড্রয়িং রুমে এসে বসল। হারুন আর হাসান তাদের ভাগের পায়েস শেষ করে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখছিল। মৃত্তিকা পরী আর দুরীর দিকে হেসে জিজ্ঞেস করল "বিচ্ছু দুটোকে সামলাও কি করে ?" পরী আর দুরী এতক্ষণ কোনো কথাই বলেনি। এত সুন্দর একটা মেয়ে যে কিনা বিদেশে চাকরি করে, অনেক লেখা পড়া করেছে তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলবে এ তাদের ভাবনার অতীত। তার ওপর সামনে কাজু দাদা বসে। দুজনের মুখ আর কথা সরছেনা দেখে কাজু হারুন আর হাসান কে নিয়ে তার ঘরে চলে গেল। কাজু চলে গেলে পরী ই প্রথম মুখ খুলল "আফনেরা আইসেন কত দূর থাইক্যা, এহন তো একটু জিরায়ে লইবেন। তা না আমরা আইস্যা ...." মৃত্তিকা তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল "তয় কি হইসে, কদ্দিন পরে মন খুইল্ল্যা কথা কইতাসি, হেয়া কি কম নাকি!" তারপর আর কথা বাঁধ মানল না। মৃত্তিকার হেয়ার স্টাইল, কানের ঝুমকো, সে কি কাজ করে এবং সেখানে ছেলেরা তার হুকুম শোনে কি না ইত্যাদি অনর্গল প্রশ্নবাণ। মৃত্তিকা হাসি মুখে সব শুনল এবং যথা সাধ্য জবাব দিল। মাত্র দু ঘন্টার মধ্যে উমা ঘোষণা করলেন ডিনার রেডি। ভাত, লাউচিংড়ি, পোস্ত দিয়ে লাউয়ের খোসা ভাজা, ডাল আর মুরগির ঝোল। সারাদিনের ক্লান্তি আর গুরুভোজন, খাওয়ার পরে কাজু কে আর ঠেকানো গেলোনা। সে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়ল। হারুন আর হাসান ঘুমিয়ে কাদা। পরী আর দুরী দুজন কে কোলে নিয়ে ফিরে যাবার সময় বার বার মৃত্তিকা আর প্রীতিকে নেমতন্ন করে গেল। মৃত্তিকা হাসি মুখে কথা দিল যে যাবার আগে অবশ্যই সে দেখা করবে। উমা দরজা বন্ধ করার পর প্রীতিও অনুমতি নিয়ে শুতে চলে গেল। কাজুর পুরোনো ঘরটায় ওর শোবার বন্দোবস্ত হয়েছে। টেবিলে পরে থাকা বাসন তুলতে তুলতে উমা মৃত্তিকা কে বললেন "এবার তুমি শুয়ে পর। আজ প্রচুর পরিশ্রম হয়েছে। কাল ধীরে সুস্থে কথা হবে।" মৃত্তিকা উমার সাথেই টেবিল পরিষ্কার করছিল। একটু চুপ করে থেকে

বলল "উমা তোমায় আমার কিছু বলার ছিল, আমায় যদি একটু সময় দাও।" উমা হাতের বাসন গুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে হাসি মুখে বলল "অবশ্যই শুনব তোমার কথা। তবে তার আগে আমার একটা অনুরোধ আছে। তুমি আমার মেয়ের মত। যদি আমায় নাম ধরে না ডাক আমার খুব ভাল লাগবে। কত রকম সম্বোধন তো আছে। মাসি, পিসি, কাকী, যা তোমার খুশি তুমি তাই বোলো।" মৃত্তিকা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল "আই এম সরি। আমি বুঝতে পারিনি তুমি বিরক্ত হচ্ছ। আচ্ছা, আমি তোমায় যদি মাসি বলে ডাকি ?" উমা এই কথার সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে অল্প হেসে বললেন "এবার বল কি বলতে চাইছিলে।" মৃত্তিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল "আমি প্রেগন্যান্ট। কাজু আর আমি দুজনেই ভীষণ খুশি। তাই ...." উমা চুপ করে শুনছিলেন। এবার এগিয়ে এসে মৃত্তিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কাজু চোখ খুলে দেখল ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্তিকা দ্রুত হাতে প্রসাধন করছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে যে টুকু আলো ঢুকছে তাতে বেশ বোঝা যায় সকাল হয়েছে অনেক্ষণ। চোখ রগড়ে কাজু জিজ্ঞেস করল "কটা বাজে ?" মৃত্তিকা মুখ না ঘুরিয়েই উত্তর দিল "সাড়ে সাত টা।" বেজার মুখে কাজু বলল "আজ না বেরোলেই নয়!" মৃত্তিকা কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগল। "ওকে!, আমায় পনের মিনিট দাও।" কাজু বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে যেতে যেতে শুনতে পেল মৃত্তিকা বলছে "রেডি হয়ে কি করবে ?" "তোমার সাথে যাব। আর কোন কাজ নেই।" বলে কাজু বাথরুমে ঢুকে গেল। বাথরুম থেকেই শুনতে পেল মৃত্তিকা বলছে "কোনো প্রয়োজন নেই। বাড়িতে থাক। আমার সাথে প্রীতি আর তার টিম থাকবে।" কাজু যখন বাথরুম থেকে বেরোল, প্রীতি আর মৃত্তিকা তখন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারছে। উমা একটা বড়সড় টিফিন কৌটো এনে টেবিলে রাখলেন। "লুচি, তরকারি আর কিছু ড্রাই ফ্রুটস আছে। দুজনের হয়ে যাবে। সময় মত খেয়ে নিও। আর সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরবে।" এই বলে উমা আবার রান্না ঘরে ঢুকে পড়লেন। কাজুর কোন কথাই মৃত্তিকা শুনল না। ঠিক আট টায় দুজন বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে জলের শুরু। জমা জল কালচে-সবুজ আর দুর্গন্ধপূর্ণ। পরী আর দুরী অনেক খাটা খাটনি করে একটা ইঁটের রাস্তা বানিয়েছে যেটা সিঁড়ির শেষ থেকে শুরু করে গলির মুখ অবধি গেছে। কুমিরের পিঠের মত এই ইঁটের রাস্তাটা কালো জলের ওপর জেগে রয়েছে। এই ঘোর গ্রীষ্মে তা দিয়ে হাঁটলে শুধু পায়ের তলাটাই ভিজবে। মৃত্তিকার কাঁধে স্যাম্পল কলেকশন এন্ড টেস্টিং কিটস আর হাতে ইনসেক্ট রেপেলেন্ট। প্রীতির এক হাতে জলের বোতল আরেক হাতে টিফিন ক্যারি। জিন্স আর স্নিকার পরিহিত মৃত্তিকা আর প্রীতির কোন অসুবিধা হলোনা গলির মুখে পৌঁছতে। হভারক্রাফট নিয়ে প্রীতির বাকি দলবল সেখানে অপেক্ষা করছিল। হভারক্রাফটে উঠে মৃত্তিকা মৃদু স্বরে প্রীতিকে বলল "প্রথমে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ।"

মৃত্তিকা আর প্রীতি বেরিয়ে যাবার পরে কাজু ঘরের মধ্যে এলোমেলো খানিক ঘুরে, খানিক টিভি দেখে অবশেষে বিরক্ত হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে "মা আজ কি বানাচ্ছ গো ?" বলে উমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। উমা দরদরিয়ে ঘামছিলেন। রান্নাঘরে এতক্ষণ সময় কাটানোর অভ্যাস তার বহুদিন চলে গেছে। "বিরক্ত করিসনা, টেবিলে খাবার রেখেছি, খেয়ে উদ্ধার কর" বলে আবার খুন্তি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাজু টেবিলে ঢাকা দেওয়া বাটির ঢাকনা খুলে লুচি আর আলুর তরকারি দেখে "ইয়াহু" বলে একটা চিৎকার করে তৎক্ষণাৎ খেতে বসে গেল। উমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন খুন্তির আগায় একটা ভাজা মাছ আশ্চর্য দক্ষতায় ব্যালান্স করতে করতে। টপাস করে কাজুর প্লেটে সেটা ফেলে দিয়ে ফিরে যাবার সময় কাজু তার হাত ধরে ফেলল। "মা বসো, কথা আছে।" উমা বললেন "দাঁড়া, ঝোলটা নামিয়ে রেখে আসি।" উমা রান্নাঘর থেকে ফিরে এলে কাজু বলল "মা একটা কথা ছিল। আসলে মৃত্তিকা ...." উমা হাত তুলে কাজু কে থামিয়ে দিয়ে বললেন "জানি, ও আমাকে বলেছে।" কাজুর এই তথ্যটি জানা ছিলনা। খেই হারিয়ে ফেলে সে খানিক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল "মা তুমি আমাদের সাথে চল। তুমি ভাবতেও পারবে না তোমায় নিয়ে আমরা কি উদ্বেগে থাকি! একটিবার গিয়ে দ্যাখ, যদি ভাল না লাগে তাহলে ফিরে এস, বাড়ি তো রইলই।" উমা চুপ করে বসে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। এই ফ্ল্যাট টা ভবেশ কিনেছিল ব্যাংক লোন নিয়ে। এর প্রত্যেকটা আসবাব, দরজা, জানালায় ভবেশের ছোঁয়া আছে। কত কষ্ট, কত ত্যাগ স্বীকার করে দুজন মিলে সুখ ধরতে চেয়েছিলেন। সুখ এসেও ছিল, তবে বড্ড কম সময়ের জন্য। কাল রাতের আগে তিনি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে যাবার কথা একমুহূর্তের জন্যেও ভাবেননি। কিন্তু কাল রাত থেকে একটা তীব্র ইচ্ছা, আবার

নতুন করে কিছু পাবার ইচ্ছা, তাকে ক্রমাগত বিদ্ধ করে চলেছে। উত্তরপুরুষ আসছে, তাকে বরণ করতে হবে, তার গলায়, গালে নাক ডুবিয়ে অতীত কে খুঁজে নিতে হবে, তার সাথে হাসতে হবে, কাঁদতে হবে। যতবার উমা খুশিতে ভেসে যেতে চাইছেন ভবেশের স্মৃতি যেন প্রতি মুহূর্তে তারদিকে আঙ্গুল তুলে বলছে "ছিঃ, শেষে পালিয়ে গেলে আমায় ফেলে!" উমা আর সহ্য করতে পারলেন না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। কাজু আর কোন কথা বলল না। সান্ত্বনা দেবার কোন চেষ্টা করল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে নিঃশব্দে ঘরে চলে গেল। উমা সামলে উঠে দেখলেন কাজু নেই। আধখাওয়া মাছ, লুচি, তরকারি আঢাকা পরে রয়েছে। "কাজু, শুনে যা বাবা, রাগ করিস না। আয় এখানে।" উমার গলার কাতরোক্তি শুনে কাজু উঠে এসে নিঃশব্দে সামনে দাঁড়াল। "রাগ করিস না বাবা, তুই বুঝবিনা। আমি যাব তোর সাথে। তবে আমায় কথা দে তুই আবার আমায় এখানে ফিরিয়ে দিয়ে যাবি।" কাজুর মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একগাল হেসে সে বলল "আই প্রমিস।" ব্রেকফাস্ট শেষ করেই কাজু বসল ফ্লাইট বুক করতে। ভয়েস কমান্ড এক্টিভেট হতেই আগের দুটো টিকিট ক্যান্সেল করে কাজু একই রো তে তিনটে সিট বুক করে ফেলল। এমব্যাসি থেকে শুরু করে হেলথ্ সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে খবর পাঠানো সব করে ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে। আজ তার মনে বড্ড আনন্দ।

মৃত্তিকার আজকের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মেডিক্যাল কলেজ, আর. জি. কর আর এন. আর.এস. তিনটি হাসপাতালই সে ঘুরে দেখেছে। মৃত ডাইনোসরের কঙ্কালের মত বিশালাকায় হাসপাতালের বাড়ি গুলো পরিত্যক্ত। হাসপাতালের দেয়ালে জলের দাগ প্রায় কুড়ি ফুট অবধি পাকা পাকি ছাপ ফেলেছে। রুগী প্রায় নেই বললেই চলে। দু একজন অর্ধমৃত বৃদ্ধ, কয়েকজন প্রসূতি ছাড়া হাসপাতালগুলো সম্পূর্ণ ফাঁকা। হপ্তায় দু দিন একজন ডাক্তার আর তার এসিস্টেন্ট আসে। জায়গায় জায়গায় ছাদ নেমে এসেছে। প্রাচীন বাড়ি গুলোর বেশির ভাগই জঙ্গলে ঢাকা। একজন মাত্র ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি তখন বাড়ি ফিরছেন। কোনো কথাই বলতে রাজি হলেন না। এর মধ্যে জেনিফার ফোন করেছিল। জেনিফার মৃত্তিকার কোম্পানিতে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেনটের হেড। আজ নাকি ল্যাব দেখতে স্টিভ এসেছিল। স্টিভ এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। "সুপার বাগ" নিয়ে বিশেষ ভাবে ইন্টারেস্টেড। জেনিফার কে পরিষ্কার বলে গেছে মৃত্তিকা যেন গুড নিউজ নিয়ে ফেরে। না হলে না ফিরলেও চলবে। প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ফিলিপ তারপর ফোন করেছিল। সেই একই কথা। ব্রিং আস সামথিং। খালি হাতে ফেরা যাবে না। কাঁধের স্যাম্পল কলেকশন এন্ড টেস্টিং কিট টা মৃত্তিকার ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছিল। আরেকটু হোম ওয়ার্ক করা উচিত ছিল আসার আগে। ভ্যাপসা গরমে সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে তার মাথা ধরে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ক্লান্ত, অবসন্ন মৃত্তিকা বলল "এভাবে ঘুরে কোন লাভ হবেনা প্রীতি, আগে একটু হোম ওয়ার্ক করা দরকার। বাড়ি ফিরে চল। আর তোমার টিম কে বলে দাও কাল আমি বেরোবো না।" প্রীতি নির্দেশে দিল ফিরে যাবার। হভারক্রাফট চললে একটু হাওয়া পাওয়া যায়। পচা জলের তীব্র গন্ধ সারাদিন পরে সয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে প্রীতির কাছ থেকে জলের বোতল নিয়ে মৃত্তিকা কয়েক ঢোক জল খেল। সহানুভূতির সুরে প্রীতি বলল "ম্যাম, শরীর খারাপ লাগছে না!, যা রোদ আর গরম!" মৃত্তিকা সানগ্লাস খুলে পাশে রেখে প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলল "আই এম সরি, তোমায় খুব কষ্ট দিচ্ছি।" প্রীতি তাড়াতাড়ি বলল "না না, আমি আপনার কথা বলছি। সারাদিন খাওয়া নেই, এই গরমে ঘোরা ....।" মৃত্তিকার মনে পড়ল সে সারাদিন খায়নি, আর সাথে সাথেই সে অনুভব করল তার বেশ খিদে পেয়েছে। "এ ম্মা, তোমাদের কারুরই তো খাওয়া হয় নি! ছিছি, আই এম রিয়ালি ভেরি ভেরি সরি। টিফিনটা কোথায় ?" প্রীতি টিফিন ক্যারি টা বেঞ্চের তলা থেকে টেনে বার করল। "প্রীতি তুমি প্লিজ খাবার গুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দাও সবার মধ্যে। সবাই যেন পায়।" প্রীতি টিফিন ক্যারি থেকে কয়েকটা লুচি, অল্প তরকারি আর ড্রাই ফ্রুটস বার করে বেশিটাই টিফিন ক্যারি শুদ্ধু বাকিদের দিয়ে দিল। উমা পরিমানে অনেক দিয়েছেন। সবাই অল্প অল্প পেল। প্রীতি একটুকরো লুচি তরকারি সহযোগে মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করে চিবোতে লাগল। মৃত্তিকা হেসে জিজ্ঞেস করল "খুব ভালো হয়েছে না ?" প্রীতি চোখ না খুলেই বলল "এরকম তরকারি আমার মা বানাত।" মৃত্তিকা নিজের গালে একটা খেজুর ফেলে চিবোতে চিবোতে বলল "এখন বানান না ?" প্রীতি চোখ খুলে অল্প হেসে বলল "নাহ, মা মারা গেছেন বছর পাঁচেক।" মৃত্তিকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল "সরি, আমি ..." প্রীতি হেসে বলল "নো প্রবলেম।" তারপর চোখ নিচু করে কতকটা স্বগতোক্তি করার মত বলে চলল "মা, বাবা, বোন সবাই

একই সাথে একই দিনে গেছে। আমি কি জানি কি করে টিকে গেলাম। টিভি তে চারদিন ধরে বলেই চলেছে ঝড় আসছে, তবু মা অফিসে গেল। বোনকে পাঠাল কোচিং ক্লাসে। সামনে বোর্ড এক্সাম, ফাঁকি দেওয়া চলবে না। আমরা থাকতাম ভবানীপুরে। বাবা-মা দুজন মিলে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিল। মা বলে গেল আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে অফিস থেকে, ঝড় আসার আগেই, আসার সময় বোনকে নিয়ে ফিরবে। মা নিজেই ড্রাইভ করত। বাবা কতবার বারণ করল। মা'র সেই এক কথা, বাবার প্রশ্রয়ে আমরা গোল্লায় যাচ্ছি। আমার তখন পার্ট টু পরীক্ষা চলছে। টের পেলাম ওরা বেরোচ্ছে। বেরোবার সময় নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠলাম না। পড়ার ডিসটার্ব হবে। ওরাও আমাকে কিছু বলল না। ঝড়ের প্রথম ধাক্কা টা আমাদের ফ্ল্যাট সয়েছিল। জানলার পাল্লাগুলো ভেঙে গিয়েছিল। তবে ওই অবধিই। মা আর বোন তখনও ফেরেনি। বাবা আর বাড়িতে থাকতে পারল না। ঝড়ের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে গেল। আমায় বলে গেল বাড়ি থেকে যেন না বেরোই। ঘন্টা খানেক পরে হঠাৎ একটা বিকট শব্দ করে সিলিং সমেত ঘরের একটা অংশ ভেঙে পড়ল। আমার মাথায় লেগেছিল। তাই কিছুক্ষণ জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হতে দেখলাম পাশের ব্লকের ছাদে লাগান মোবাইল টাওয়ার টা ভেঙে পড়েছে আমাদের ব্লকের ওপর। টপ ফ্লোর নয়, তাই পুরো ছাদ টা ভাঙেনি। ঝড় তখনও চলছে। তারপরের দু দিন কি ভাবে কেটেছে বলতে পারব না। চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। ঝড় থামলে পাশের বাড়ির লোকরা আমায় তুলে নিজেদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। বাবা, মা, বোন কেউই আর ফেরেনি। নিচের ফ্ল্যাটের কাকুর কাছে শুনলাম বাবা বেশিদূর যেতে পারেনি। ফ্ল্যাটের কাছেই একটা নিওন সাইন বাবার ওপর ভেঙে পড়েছিল। উনি সেটা দেখতে পেয়েছিলেন। মা আর বোনের খোঁজ পাইনি বেশ কয়েক দিন। ফোন সার্ভিস ঠিক হবার পর খবর পেলাম। ইনস্যুরেন্স কোম্পানি খবর দিল। আমার মা আর বোন সমেত গাড়িটাকে ওরা বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে আধ ডোবা অবস্থায় পেয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আমি কোনো বেনিফিট পাবো না। তারপর ....." প্রীতি চোখ তুলে তাকিয়ে চুপ করে গেল। মৃত্তিকা এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। হভারক্রাফটের প্লাস্টিকের ছাউনি থেকে ঝোলানো টিমটিমে একটা আলোয় তার চোখের জল ঝকমক করছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। সিকিউরিটি গার্ডের গলা শোনা গেল "পৌঁছে গেছি।"

পরী আর দুরী রোজই একসাথে কাজে বেরোয়। হারুন আর হাসান দু'ভাই কেরামত চাচার কাছে থাকে। বিশুর ভুটভুটি ঘড়ি ধরে ন'টার সময় গলির মুখে দাঁড়ায়। আজও ঠিক ন'টার সময় ভুট ভুট শব্দ করতে করতে বিশুর নৌকা গলির মুখে এসে দাঁড়াল। পরীরা তখনও পৌঁছয়নি। নৌকায় একটি মাত্র যাত্রী তারিক আলী হাত দিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে বিশু কে জিজ্ঞাসা করল "এই গলিটা ?" লাইট পোস্টে নৌকা বাঁধতে বাঁধতে বিশু বলল "হ্যাঁ, একটু এগিয়ে গিয়ে ছ'তলা বাড়ির ডান হাতের তিনতলা।" তারিক মন দিয়ে গলিটা আর তার আসপাসটা লক্ষ্য করছিল। এবার বিশুর দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল "ঠিক জানিস তো ?" বিশু বলল "পাকা খবর। আজ সকালে মেয়ে দুটো হভারক্রাফটে চড়ে বেরিয়েছে। আমি খবর নিয়েছি।" জলের ওপর চটির ছপাস ছপাস শব্দ করতে করতে পরী আর দুরী হাজির হল। যার যার হাতের কোচ দুটো নৌকায় তুলে দিয়ে তারা নিজেরা উঠে বসল। তারিক আলী হেসে পরীকে বলল "সালাম আলেইকুম, কেমন চলে কাম কাজ ?" পরী আর দুরী দুজনেই শুভ কামনা জানিয়ে চুপ করে গেল। তারা তারিক কে চেনে। তারিক উঠতি মস্তান। মেয়ে পাচার আর ডাকাতি করে হালে সে এলাকার ত্রাস। মিনিট পনের চলার পর পরী আর দুরীর কাজের জায়গা এসে গেল। যে বহুতলে তারা আয়ার কাজ করে সেটা বড় রাস্তার একদম ওপরে। ভাড়া মিটিয়ে যে যার কোচ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একতলার কার্নিশ থেকে পাতা তক্তার ঠিক সামনে এনে বিশু নৌকা দাঁড় করাল। দুই বোন লঘু পায়ে তক্তা দিয়ে হেঁটে কার্নিশে পৌঁছে সামনের দেয়ালের গর্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পরী বলল "তারিক মিঞা কে আগে তো এদিকে দেখিনাই। আইজকে হঠাৎ .... আমার জানি কেমন কেমন লাগে।" দুরী বলল "আমারও। আপা, আমাদের একটু সাবধান হওন লাগত। দিন-কাল ভালা না।" কথা আর এগোলনা। পরীর কাজের বাড়ি এসে গেছে। পরীর কাজ শেষ হতে হতে পৌনে আট'টা হয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াহুড়ো করে নেমে দেখল দুরী আগেই পৌঁছে গেছে কার্নিশের সামনে। রাত নেমেছে অনেক্ষণ। চারি দিক ঘন অন্ধকার। পরী মুখঝামটা দিয়ে উঠল "তরে কইসি না একা একা বাইর হইতি না, দিন কাল ভালা না। শুনিস না ক্যা ?" দুরী কোন উত্তর দিল না। এক দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে

রইল। এটা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এতক্ষণে একটা ঝগড়া পাকিয়ে ওঠার কথা। উদ্বিগ্ন পরী দুরীর হাতে ধরে বলল "কি হইসে ? শরীর ভালা না ? কথাটা কি ? কইবি তো ?" দুরী বলল "আপা, আমার ভালা ঠ্যাকতাসেনা। তারিক মিঞা এমনি এমনি আজ নৌকায় উঠে নাই। ওর মতলব আসে।" পরী বলল "হ, আমারও তাই মনে হয়।" দুরী বলল "আমি ভাবতাসি বিশুরে আজ একটু বাজায়ে দেখুম। ও হালার সব খবর রাহে।" পরী কথার উত্তর দেয়ার আগেই রাস্তার মোড়ে আলো দেখা গেল। তারপরই ভুট ভুট শব্দ করতে করতে বিশু তার নৌকা নিয়ে নিখুঁত দক্ষতায় কাঠের পাটার সামনে এসে দাঁড়াল। দুই বোন একে একে নৌকায় উঠল। দুরী আগে, পিছনে পরী। দুরী আজকে পরীর পাশে বসল না। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বিশু যেখানে হাল ধরে বসে আছে, সেখানে বসল। নৌকায় আর কেউ নেই। বিশু সাথে সাথে নৌকা ছেড়ে দিল। দুরী আদুরে গলায় জিজ্ঞাসা করল "ভাইজান, রাতের বেলায় আপনে কি কইরা যে নাও লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুইরা বেড়ান! আপনের ডর লাগেনা ?" বিশু মুচকি হেসে জবাব দিল "ভয় করলে খাব কি ? তাছাড়া ভয়-টয় এই বিশু মন্ডল পায় না।" দুরী মিষ্টি হেসে বলল "আপনের বলে খুব সাহস! আমরা দুইজন তো ভয়েই মরি। ভাগ্যে আপনে আছিলেন, না হইলে আমাদের যে কি হইত!" বিশু দুরী কে বেশ পছন্দ করে। আগে নানান ছল ছুতোয় কাছে আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দুরীর নিস্পৃহতা তাকে দূরেই সরিয়ে রেখেছে। বিশুর কথা বলার ধরন বদলে গেল। "ভয় কিসের ? কাকে ভাই বলেছিস মনে রাখিস, বিশুকে চেনেনা এমন লোক এলাকায় নেই। ঝামেলা দেখলে আমায় একবার খবর দিবি। বাকি আমি বুঝে নেব।" "হেয়া তো আমি জানি, কিন্তু দুনিয়ায় খারাপ লুকের তো অভাব নাই, এই তো দ্যাহেন তারিক মিঞা, আইজ সকালে কেমন ভাবে য্যান তাকায়ে ছিল। আমার তো ভয়েই জান বাইরোইয়া যায় আর কি !" বিশু গম্ভীর গলায় বলল "তোদের কোন চিন্তা নেই। আমি তারিকের সাথে কথা বলে নিয়েছি। তোদের কিছু হবে না।" দুরী সবে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল তবে কাদের জন্য চিন্তা, একটু দূরে হভারক্রাফটের শব্দ শোনা গেল। বিশু তার নৌকাটা রাস্তার একদম ধারে নিয়ে এল। মিনিট খানেকের মধ্যেই বিকট শব্দ করতে করতে হভারক্রাফট তাদের পাস দিয়ে চলে গেল। পরী-দুরীর নামার জায়গার সামনেই সেটি স্থির হল। কাঠের পাটা ইঁটের রাস্তার জেগে থাকা অংশে লাগতেই প্রথমে প্রীতি, তারপর মৃত্তিকা নেমে এল। ওরা নেমে গেলে বিকট শব্দ করতে করতে হভারক্রাফট অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিশু এবার তার নৌকা লাগাল ইঁটের রাস্তার ধারে। পরী আর দুরী অভ্যস্ত পায়ে নৌকা থেকে ইঁটের ওপর লাফিয়ে নামল, তারপর সামনে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে দুরী বলল "ইসস, প্রায় বাইর কইরা ফালায়সিলাম রে, হারামজাদা বাইচ্চা গ্যাল।" পরী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল "আমি হগগলি বুজছি, তারিকরে এই হালায় খবর দিসে। মৃত্তিকা আপা আর প্রীতি আপা যখন জাহাজ থেইক্যা নামল, তখন বিশুর চোখের চাউনি আমি দ্যাখসি। খুবই বিপদ রে দুরী। মাথা ঠান্ডা কইরা ভাবতে হইব।" দুরী ফোঁস করে উঠে বলল "ওই দুইডারে কোচ দিয়া ..." পরী বলল "চুপ কর এখন, আজ কিছু হওনের নাই, বিশু আজ খবর দিলে যা হইবার কাল হইব। এখন বাড়িত চ।"

অনেক্ষণ ধরে চান করার পর মৃত্তিকার যেন ধরে প্রাণ এল। কাজু আর প্রীতি লিভিং রুমে আড্ডা দিচ্ছে। মৃত্তিকা চুল মুছতে মুছতে লিভিং রুমে এসে বসল। কাজুর হাতে প্রীতির পিস্তল। কাজু জীবনে আগ্নেয়াস্ত্র ধরে দেখেনি। ফলে কৌতূহল একটু বেশিই। প্রীতি কাজুর হাত থেকে পিস্তল টা নিয়ে বলতে শুরু করল "এটা গ্লক ১৭, স্ট্যান্ডার্ড মডেল, সেমি অটোমেটিক, এটা সেফটি ক্যাচ, এটা অফ করে দিলে ...." ইতিমধ্যে উমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনিও দাঁড়িয়ে পরে শুনতে থাকলেন। সকলেরই খুব কৌতূহল। কাজু মিনমিন করে বলল "একবার ছুঁড়ে দেখলে হয় না ?" কিন্তু কাজুর অনুরোধ সাথে সাথে উমা নাকচ করে দিলেন। বাচ্চা ছেলের মত কাজু ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করল। ইতিমধ্যে কলিং বেল বেজে উঠেছে। উমা আই গ্লাস দিয়ে দেখে দরজা খুলে দিলেন। ঘরে হুড়মুড় করে হারুন আর হাসান ঢুকে পড়ল। আজ দুই ভাইয়ের জড়তা কেটে গেছে। তারা সোজা কাজুর হাত ধরে টানাটানি করতে আরম্ভ করল – তাদের সাথে খেলতে হবে। পরী আগে আর পিছন পিছন দুরী ঢুকে একজন আরেকজনের দিকে চেয়ে বিব্রত মুখে সোফার ওপর বসে পড়ল। উমা দরজা বন্ধ করে দিলে পরী ই প্রথমে কথা বলল। "মাসী, আইলাম আপনেগো জ্বালাইতে।" উমা এই কথার কোনো জবাব না দিয়ে হেসে বললেন "চিঁড়ে ভাজা খাবি ? বাদাম আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ?" এবার পরী আর দুরী একসাথে মাথা নাড়ল। উমা রান্নাঘরে চলে গেলে মৃত্তিকা একটা চেয়ার টেনে পরীর সামনে এসে বসল। পরী হেসে বলল "আপা,

আপনেরে আইজ দ্যাখলাম, জাহাজ থেইক্যা নামলেন। আমরা আপনাগো পিছনেই ছিলাম। আপনের কাম-কাজ সব ঠিক হইসে ?" মৃত্তিকা মাথা নেড়ে বলল "নাহ, কিসুই ঠিক হয় নাই। খালি ঘোরাই হইসে।" দুরী বলল "আপা আপনে কি খোঁজেন ? আমাগো বলেন, আমরা খুইজ্জা দিয়ামনে। আপনি রোদে বাইর হয়েন না। "মৃত্তিকা হেসে ফেলল।" আমি খুঁজি এমন একটা লোক যার জ্বর হইসিলো, কিন্তু সাইরা উঠসে। এমন লোক একটাও পাইলামনা। এই যে নতুন গুড়ি গুড়ি, সারা গায়ে ছিট ছিট মশা গুলি দ্যাখতাস না, ওদের কামড়ে এই জ্বর হয়। আমি যেইখানে কাম করি সেইখানে অনেকে মিলল্যা এই জ্বরের ওষুধ বানাইতাসি। হ্যারাই আমায় পাঠাইসে। কিন্তু .... "কথা শেষ করার আগেই মৃত্তিকা খেয়াল করল দুই বোনই ভীষণ উত্তেজিত, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, একজন আরেকজনের হাত চেপে ধরেছে।" মৃত্তিকা অবাক হয়ে বলল "কি হইসে, থম মাইরা গ্যালা ক্যা ?" পরী বলল "আপা, এই লোক যদি খুইজ্যা পান, তারে লইয়া কি করবেন ?" মৃত্তিকা বলল "কিসুই না, হাতের থেইক্যা একটু রক্ত নিবাম, ব্যাস।" দুরী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল "তাইলে আপনের আর বাইরে ঘোরার দরকার হইত না ?" মৃত্তিকা যথেষ্ট অবাক হয়েছে, তবুও সে মুখে সেটা প্রকাশ করল না। হেসে বলল "না, তুমরা চিন নাকি কাউরে ?" দুই বোন খানিক গা ঠেলাঠেলি করার পর পরী মুখ খুলল "বোঝলেন আপা, হারুন আর হাসানের বাপেরা তখনও বাইচ্চা। হারুন আমার প্যাডে আর হাসান ওর প্যাডে। ওদের বাপেদের জ্বর আইল প্রথম। আমাদেরও জ্বর আইল তার পরপরই। ওদের বাপেরা বাঁচল না। তিন দিনের মাথায় দুই জনেরই এন্তেকাল হল। আমাদের উইঠ্যা বওনের সাইধ্য ছিলনা। শেষ বেলায় জলটাও মুহে দিতে পারি নাই। তারপর কি জানি আল্লার মর্জি, আমাদের জ্বর সাইরা গেল। হারুন-হাসান দুইডা পয়দা হলে আমরা এইখানে আইস্যা উডলাম। তারপর থেইক্যা আল্লার দয়ায় আমাগো আর কখন জ্বর-জারি কিসু হয় নাই। হারুন-হাসানেরও কখনো কিসু হয় নাই। এই যে রোজ বাইরোই, মশা ত রোজই কামড়ায়, মশা মারার ত্যাল মাখি আর যাই করি। কই, কহন কিসু তো আর হয় নাই।" কথা শেষ হতেই মৃত্তিকা প্রায় লাফিয়ে উঠল, তারপর পরীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল নিজের ঘরে। দুরী এল পিছন পিছন। মৃত্তিকার এই অদ্ভুত ব্যবহারে প্রীতি আর কাজু অবাক হয়ে কথা বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। কাজু উঠে এসে মৃত্তিকা কে জিজ্ঞেস করল "এনি প্রবলেম ?" মৃত্তিকা তখন দ্রুত হাতে নিজের স্যাম্পল কলেকশন এন্ড টেস্টিং কিট টা খুলতে ব্যস্ত। মুখ না তুলেই জবাব দিল "নাথিং, জাস্ট সি দ্যাট আই এম নট ডিসটারবড।" দুজনের হাত থেকেই স্যাম্পল কালেক্ট করে এনালাইজারের ভিতরে রেখে মৃত্তিকা পরী কে বলল "হারুন আর হাসান কেও ডাক দেও, ওদেরও দরকার"। হারুন আর হাসানের স্যাম্পল কলেকশন হয়ে গেলে পরী মৃদু স্বরে বলল "আপা, আমরা যাই ?" মৃত্তিকা কোনো উত্তর দিল না। তার চোখ এনালাইজারের স্ক্রিনের ওপর নিবদ্ধ।

পরীরা চলে গেছে অনেক্ষণ। রাতের খাওয়ার সময় কাজু আর প্রীতি দু'বার এসে মৃত্তিকা কে সেধে গেছে। মৃত্তিকা তাদের কথার উত্তর দেয়নি। উমা বেশ বিরক্ত। এই অবস্থায় না খেয়ে থাকা মানে ভীষণ ক্ষতি। কাজু মৃত্তিকার এই মানসিক অবস্থা আগেও দেখেছে। তাই খুব একটা বিচলিত হোলনা। উমা কে বুঝিয়ে শুঝিয়ে শুতে পাঠিয়ে কাজু চুপচাপ ঘরে শুয়ে পড়ল। মৃত্তিকার দু চোখ তখনও এনালাইজারের পর্দায় নিবদ্ধ। হাতের সামনে টাচ প্যাড রাখা, থ্রী ডি প্রজেকশনে নানান জটিল আকৃতি ভেসে উঠছে। কাজু পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

উমার ঘুম খুব পাতলা। সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়। আজকেও তাই হল। কে যেন ফ্রিজ খুলেছে। উমা ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে চারটে বাজে। এত সকালে কে উঠল! খাট থেকে নেমে ঘরের দরজা খুলে দেখলেন মৃত্তিকা কাল রাতের না খাওয়া রুটি আর জ্যামের শিশি নিয়ে বসেছে। উমা কে দেখে একগাল হেসে বলল "হাই মাসি, গুড মর্নিং।" উমা হেসে গুড মর্নিং বলে জিজ্ঞেস করলেন "খুব খিদে পেয়েছে, না ?" মৃত্তিকা খেতে খেতে বলল "ভীষণ !" উমা ফ্রিজ খুলে রেডিমেড খাবারের একটা প্যাকেট বার করে নিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলেন। দু মিনিট পরে ফিরে এলেন এক প্লেট ধোঁয়া ওঠা চাউমিন নিয়ে। মৃত্তিকা চাউমিনের প্লেট হাতে নিয়ে একটা ছোট থ্যাংকস দিয়ে খেতে শুরু করে দিল। বাইরে আলো ফুটতে দেরি আছে। উমা মৃত্তিকার সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। মৃত্তিকা খেতে খেতে বলল "জানো মাসি, একটা সল্যুশন সম্ভবত পেয়েছি। পরী দের চারজনের রক্তেই একটা স্পেশাল টাইপের প্রোটিন মলিকিউল আছে। আমার মনে হয় এটাই ওদের 'সুপার বাগে'র হাত থেকে রক্ষা করছে।" উমা বললেন "তাহলে জ্বরের ওষুধ বানান যাবে এখন ?" মৃত্তিকা বলল "এত চট

করে হবে না। সময় লাগবে। তবে একটা ডিরেকশন পাওয়া গেছে। এবার সে দিকে এগিয়ে যেতে হবে।" প্রীতি এর মধ্যে ঘুম থেকে উঠে লিভিং রুমে চলে এসেছে। মৃত্তিকার কথা শুনে সেও উচ্ছসিত। উমা বললেন "কাজু টাকে ঘুম থেকে তোল। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর ও পরে পরে ঘুমোচ্ছে।" উমা আর কারুর ভরসায় থাকলেন না। নিজেই চেঁচিয়ে ডাকলেন "কাজু, এই কাজু, ওঠ ঘুম থেকে। কতবড় একটা কান্ড হয়ে গেল আর তুই ...." কাজুর ঘর থেকে নিদ্রা বিজড়িত গলায় উত্তর এল "আবার কি হলো ?" মৃত্তিকা চেঁচিয়ে বলল "উই ডিড ইট! কেল্লা ফতেহ!" কাজু চোখ মুছতে মুছতে লিভিং রুমে আসার সাথে সাথে তিনজন তিনরকম ভাবে মৃত্তিকার সাফল্যের কথা বলতে শুরু করল। সব শুনে কাজু বলল "কনগ্রাটস মৃত্তিকা, কিন্তু যাদের জন্য এতসব হলো তাদেরও জানানো দরকার। চলো, আমরা ছাদে যাই। ওদের এখুনি একটা থ্যাংকস দেওয়া দরকার।" মৃত্তিকা হেসে বলল "ঠিক কথা, আমি ড্রেস টা চেঞ্জ করে নি। দু মিনিট।" প্রীতিও চলল পোষাক বদলাতে। চটজলদি জিন্স আর টি শার্ট চাপিয়ে বেরোবার সময় অভ্যাস বসত পিস্তল টা হিপ পকেটে ঢুকিয়ে নিল। ওটা সঙ্গে না থাকলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

তারিক আলী সকাল সকাল উঠে তৈরি হয়ে নিয়েছে। সকাল বেলা সময় টা খুব সুবিধের। মানুষজন এই সময় একটু ঢিলেঢালা থাকে। শিকার করার এইটাই সবচেয়ে ভাল সময়। তারিকের দলের বাকিরাও তৈরি। বেশি লোক প্রয়োজন নেই। সে ছাড়া আর পাঁচটা ছেলে। চারটে তো মাত্র লোক। তার মধ্যে একটা বুড়ি। এই কাজ সে আগে বহুবার করেছে। কলিং বেল টেপার পর যদি দরজা খুলে দেয় তাহলে ঝামেলা নেই। নাহলে দরজা ভাঙতে হবে। সে সব যন্ত্রপাতি তারিকের আছে। তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। তাকে বাধা দেবার মত লোক এই অঞ্চলে নেই। মেয়ে দুটোকে তারিক দেখেছে। দাম ভালোই পাওয়া যাবে। বুড়িটাকে আর ছেলেটাকে কেটে পাঁকে পুঁতে দিলেই চলবে। বুড়িটা মালদার। তারিক অবশ্য লুটের মাল নেয়না। ওটা তার সঙ্গে যারা যাবে তাদের বোনাস। বিশু ঘ্যান ঘ্যান করছে দুরী বলে মেয়েটার জন্য। সে খেয়াল করে দেখেছে দুই বোন বেশ শক্ত পোক্ত। ওর দিদি টা ছেড়ে দেবেনা। লড়াই একটা হবেই। অকারণ ঝামেলা তারিক পছন্দ করেনা। বিশু টা বোঝালে বুঝতে চায়না। এদিকে বিশু হাতছাড়া হয়ে গেলে এলাকার খবর পাওয়া মুস্কিল হবে। যাকগে, বড়টা ঝামেলা করলে কেটে ফেললেই হবে। কোমরে দেশি পিস্তলটা গুঁজে তারিক হাঁক দিল "বিশুকে আসতে বল। বেরোব।"

ছাদের দরজাটা ভেঙে গেছে বহুদিন। একটা পুরোনো টিনের দরজা জোগাড় করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ভেঙে যাওয়া দরজাটার কব্জার সাথে। মৃত্তিকা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বার কয়েক "পরী, পরী" বলে ডাকতেই দরজা খুলে পরী বেরিয়ে এল। "আসেন, আসেন, আইরে দুরী, দ্যাখ কারা আইসেন।" পরী দু'হাত দিয়ে তুলে দরজাটা সরিয়ে দিল। আকাশে সবে আলো ফুটেছে। চমৎকার ঠান্ডা হাওয়া বইছে। লিফটের ঘরের দেয়ালকে পিছনে রেখে একটা টিনের চালের ঘর। ঘরের বাকি দেয়ালগুলো নানা রঙের বিজ্ঞাপনের বোর্ড দিয়ে তৈরি। ছাদের এক কোণে আরেকটা চারকোণা আড়াল। ওটাই বাথরুম। গোটা তিনেক বালতি বাইরে রাখা। গোটা ছাদটা ঝক ঝকে করে ঝাঁট দেওয়া। প্লাস্টিকের গামলায় একটা লাউ, একটা পুঁই, একটা মাধবীলতা। বৃদ্ধ কেরামত মাটিতে বসে একটা ভাঙা খুন্তি নিয়ে গামলার মাটি খোঁচাচ্ছিল। তাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানাল। দুরী ঘরের ভিতরে ছিল। তাদের দেখে তাড়াতাড়ি একটা মাদুর এনে ছাদে বিছিয়ে দিল। "মাসি, আয়েন, বয়েন। আপনে আইজ প্রথমবার আইলেন। একটু চা করি।" উমা আরাম করে মাদুরে বসে বললেন "হারুন আর হাসানকে দেখছিনা রে।" পরী বলল "ওরা ঘুমাইতাসে।" মৃত্তিকা আর প্রীতি ছাদের একধারে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। দূরের বহুতলের ছাদে লোকজনের চলা ফেরা চোখে পড়ছে। দিনের শুরুর সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হয়েছে মৃত শহরে। দুরী হাত মুছতে মুছতে মৃত্তিকার পাশে এসে দাঁড়াল। "কি দ্যাহেন আপা ?" মৃত্তিকা বলল "ক দেহি ওই দূরের ছাতে কারা থাহে ?" "নাম জানিনা, দুইডা বাচ্চা লইয়া একটা বউ আর একটা লোক থাহে। লোকটা ইলেক্ট্রিকের মিস্তিরি। বউডা দুই বাড়িত কাম করে। নাম ময়না। এহানে যারা থাকে, হোগগলে ই আমাগো লাগান। যাওনের আর কোন জায়গা নেই। আচ্ছা আপা, কাল যে রক্ত নিলেন, কিসু বোঝলেন ?" মৃত্তিকা হেসে বলল "হেই ডাই তো কইতে আইলাম, যা খুঁজতে আইসলাম হেয়া পাইসি।" "তাইলে আপনের কাম ঠিক ঠাক হইসে তো ?" দুরী হেসে বলল। "হইসে"

মৃত্তিকা হেসে বলল। "তাইলে আজ আর বাইর হইতেন না তো ?" দুরী জিজ্ঞাসা করল। "নাহ, আর দরকার নাই। কিন্তু ক দেহি তুই আর পরী বার বার আমায় বাইর হইতে না করস ক্যা ?" দুরী একটু চুপ করে থেকে বলল "দিন কাল ভালা না আপা, আপনেরা যে আইতাসেন-যাইতেসেন, অনেকে দ্যাখসে। তারিক আলী বইল্যা একটা হারামজাদা সে দিন এই গলির কাছে আইসিল। লোকটা মেয়ে ধইরা বাইরে পাচার করে। আমি আর পরী তাই আপনেগো মানা করসিলাম।" পরী একটা থালায় চায়ের কাপ সাজিয়ে হাজির হয়েছে। মৃত্তিকা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল "কইস কি ? এত সাহস !" প্রীতি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার মৃত্তিকার হাত ধরে বলল "ম্যাম, ঘরে চলুন।" মৃত্তিকা হেসে বলল "ধুস, আমরা এত গুলো লোক আছি। দিনের বেলায় এত সাহস কারো হবে না।" "তবু আপনি ঘরে চলুন। আমার টীম আজ আর আট টায় আসবেনা। আমি খবর দিলেও সব এরেঞ্জ করে আসতে আসতে দশটা বাজবে। তার আগে অবধি আপনি ঘরের বাইরে থাকবেন না, প্লিজ।" প্রীতির শেষের কথাগুলো খানিকটা অনুনয়ের মত শোনাল। দূরে কোথাও ভুট ভুট শব্দ করে একটা নৌকা আসছে। ছাদ থেকে গলির মুখটা দেখা যায়। শব্দটা বাড়তে বাড়তে গলির কাছে এসে থামল। নৌকা থেকে লাফিয়ে নামল ছজন। তাদের হাতে শাবল, কুড়ুল, রামদা, ভোজালি। পরী আর্তনাদ করে উঠে বলল "তারিক আইসে। সঙ্গে ওর দলের বাকি ছেলেরা। আপা, ওরা তোমাদের জন্য আইসে।" বিহ্বল মৃত্তিকার হাত থেকে কাপ'টা পড়ে ভেঙে গেল। প্রীতি মৃত্তিকার হাত ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। হতভম্ব কাজু আর উমা কি হয়েছে কি হয়েছে করে তাদের পিছনে ছুটলেন। পরী আর দুরী ঘুমন্ত হারুন আর হাসান কে কোলে করে প্রায় একই সাথে নীচে নামতে লাগল। সাত তলার ছাদ থেকে যখন তারা চার তলায় পৌঁছল তখন নীচ থেকে তারিক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। নিশ্চিন্ত, আত্মবিশ্বাসী, ধীর পদক্ষেপ। কোনো তাড়া নেই। দলবদ্ধ পদক্ষেপ কিন্তু তিন তলায় থামল না। পরী হারুন কে বুকে জড়িয়ে ককিয়ে উঠল "আমাগো আগে শ্যাষ করব !" মৃত্তিকা কে ঠেলে পিছনে পাঠিয়ে প্রীতি তৈরী হয়ে দাঁড়াল। ছাদে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। সিঁড়ির মোড় ঘোরার আড়াল টুকু তাকে বেশি সাহায্য করবে। এদের তাড়িয়ে যদি দোতলায় পাঠান যায় তাহলে ফ্ল্যাটে ঢুকে পরার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। তারিকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। দলের সঙ্গীর সাথে হাফ ধরা গলায় বাড়ি গিয়ে কি খাবে আলোচনা করছে। একটা মাথা প্রথমে দেখা গেল, পাশে আরেকটা। তারপর হাফ শার্ট আর লুঙ্গি, লাল গেঞ্জি আর জিন্স। দু জনেই প্রীতিকে দেখে থমকে গেল। দু চোখে অবিশ্বাস। তারপরেই লুঙ্গি আর হাফ শার্ট ডান হাতে ধরা ভোজালি তুলল। একই সাথে লাল গেঞ্জি হাতের দা টা তুলল ছুঁড়ে মারবে বলে। চারিদিক কাঁপিয়ে গুলির শব্দের সাথে লাল গেঞ্জি চিৎ হয়ে পড়ে গেল। লুঙ্গি আর হাফ শার্ট একলাফে চারটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে প্রীতির সামনে এসে ভোজালি তুলল। প্রীতি এত দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য তৈরি ছিলনা। পিছতে গিয়ে সিঁড়িতে পা আটকে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। উমা আর মৃত্তিকা একসাথে আর্তনাদ করে উঠলেন। হাফ শার্টের উদ্যত হাত কিন্তু নীচে নামল না। পরীর ফেলে আসা কোচ টার সব কটা পেরেক তার বুকে ঢুকে গেছে। লোকটা একটা হেঁচকি তুলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে গেল। বৃদ্ধ কেরামত বাকিদের সরিয়ে নীচে নেমে প্রীতিকে হাত ধরে টেনে তুলে বলল "লড়াই-কাইজ্জা মেয়া লুকের কাম নয়, পিছায়া দাঁড়াও, আমি আগগুইয়া যাই।" প্রীতিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে কেরামত এক হেঁচকায় হাফ শার্টের বুক থেকে কোচ টা খুলে "আলী-আলী" বলে হুঙ্কার ছেড়ে সিঁড়ির মোড় ঘুরতেই কান ফাটিয়ে গুলির শব্দ হল। সমবেত আর্তনাদের মধ্যে কেরামত কাত হয়ে ঢলে পড়ল। কেরামতের মৃত্যু যেন এই ভীত, সন্ত্রস্ত লোকগুলোর রন্ধ্রে, রন্ধ্রে আগুন জ্বালিয়ে দিল। প্রীতি পর পর ফায়ার করতে করতে নীচে নামতে শুরু করল। পরী আর দুরী তার পিছনে কুড়িয়ে নেওয়া দা আর ভোজালি নিয়ে চিৎকার করতে করতে নীচে নামতে লাগল। হারুন আর হাসান কে কোলে নিয়ে কাজু, উমা, আর মৃত্তিকা তাদের পিছনে। তারা আর কোন বাধা পেলনা। বাইরে জলের ছপ, ছপ শব্দে বোঝা গেল ওরা পালিয়েছে। উমা চাবি দিয়ে দরজা খোলার সাথে সাথে সবাই ভিতরে ঢুকে পড়ল।

তারিক বাধা পেয়ে পিছু হটতে অভ্যস্ত নয়। লুট পাট করতে গিয়ে এতদিন অবধি তার একটা লোকেরও কোনো ক্ষতি হয় নি। লোকজন ধস্তাধস্তি করেছে, ছোটখাট হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করার চেষ্টা করেছে অথবা কেঁদেছে, কাকুতি মিনতি করেছে। সে এই প্রতিক্রিয়াগুলো দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ হঠাৎ পিস্তল হাতে একটা মেয়ে সব গোলমাল করে দিল। অপদার্থ এই বিশু টা! একবারও বলেনি মেয়েটার কাছে পিস্তল আছে। জানলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত। খামোখা দুটো ছেলে

খালাস হল। পরী-দুরীর কথা সে ভাবেনি অবধি। আর তাদের ধরতে গিয়েই এই অশান্তি। তারিক ছুটতে ছুটতে গলির মুখে পৌঁছে দেখল বিশু নৌকায় বসে বিড়ি টানছে। তাদের ছুটে আসতে দেখে বিড়ি ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "কি রে ছুটছিস কেন ? মাল গুলোকে আনলি না ? আর দুরী কে কোথায় রেখে এলি ?" ইঁটের রাস্তা থেকে নৌকার গলুই এ উঠে তারিক একটা বড় দম নিল। দৌড়া দৌড়ি অভ্যেস নেই। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উদগ্রীব বিশুর বুকে দেশি পিস্তলটা ঠেকিয়ে চালিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে ফোন বার করে একটা নম্বর ডায়াল করে সংক্ষিপ্ত কিছু নির্দেশ দিল। বাকিরা ততক্ষণে নৌকায় উঠে পড়েছে। পা দিয়ে ঠেলে বিশুর লাশটা জলে ফেলে দিয়ে সে সঙ্গীদের বলল "আরেকটু সময় লাগবে। মাল নিয়ে আসতে বলেছি। ততক্ষণ এখানেই বস।"

সবাই এক সাথে কথা বলছে ! কেউ কারুর কথা শুনছে না। ভয়, দুঃখ, রাগ আর অবিশ্বাস সবাইকে এক সাথে বিমূঢ় করে দিয়েছে। পরী আর দুরী চিৎকার করে কাঁদছে। গালাগালি দিচ্ছে। হারুন আর হাসান তাদের মায়েদের দেখা দেখি আকুল হয়ে কেঁদে চলেছে। উমা বারবার বলে চলেছেন "আমায় যেতে দে। আমি ওদের বুঝিয়ে বলব ...." কাজু প্রাণপণ চেষ্টা করছে মা'কে বোঝাবার। প্রীতি ফোন করেছে তার বস কে। চিৎকার করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে তাদের পরিস্থিতি। প্রীতি বিরক্ত হয়ে ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে মৃত্তিকা জিজ্ঞেস করল "তোমার টীম আসছে ?" প্রীতি হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বলল "আসছে, তবে কম করে আরও দু'ঘন্টা। ততক্ষণ ...., আমি সব কটা রাউন্ড খরচা করে ফেলেছি।" মৃত্তিকা কোন কথা না বলে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

স্টিভ জোনাথন রাতে শোয়ার আগে কিছুক্ষণ একা থাকা পছন্দ করেন। তা তিনি নিজের বাড়িতে থাকুন বা অন্য কোনো মহাদেশে। এই সময়টায় তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেন। লোকে বলে তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান। হয়ত ঠিকই বলে। এই যে বছর দশেক আগে তেলের ব্যবসা ছেড়ে ফার্মা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছিলেন, সেটাতো ভবিষ্যৎ দেখতে পান বলেই। আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী আর ক্ষমতাবান ওষুধ কোম্পানির তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হর্তা, কর্তা, বিধাতা। এই যে পৃথিবীজোড়া মানুষের ভাল মন্দ খানিকটা তার ওপর নির্ভর করে রয়েছে, এই ভাবনাটাই খুব আনন্দদায়ক। সব দেশের সরকার, বিরোধী সবাই তাকে তোয়াজ করে চলে। এই সাফল্যের পিছনে যে সিক্রেট টা আছে, সেটা উনি কখনও কাউকে বলেন না। ব্যাপারটা হচ্ছে তার মনের ভিতর আরেকটা স্টিভ বাস করে। যখনই কোনো গুরুতর বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার মনের ভিতরের স্টিভ তাকে ঠিক-ভুল বলে দেয়। ঠিক হলে একটা চনমনে ভাব আসে আর ভুল হলে একটা অস্বস্তি, আনচান ভাব। স্টিভের ভিতরের আরেকটা স্টিভ কখনও ভুল করেনা, ভুল বলেনা। যেমন মার্গারেট কে বিয়ে করার ব্যাপারটা। ভিতরের স্টিভ তাকে বারণ করেছিল, কিন্তু প্রেমে অন্ধ হয়ে কাজটা তিনি করেই ফেলেন। একবছর পরে ডিভোর্স আর গাদা গুচ্ছের টাকা এলিমনি। আবার পেট্রো ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত, সবাই তাকে বারণ করেছিল। কিন্তু তিনি তার ভিতরের স্টিভের কথা শুনেছিলেন। ফল পেয়েছেন হাতে নাতে। আজ তিনি পৃথিবীর প্রথম দশজন ধনীর একজন। স্টিভ হাতে ধরা স্কচের গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন। সাফল্য আর দামি স্কচ দুটোই একটু সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে হয়। পাশে রাখা ফোনটা বেজে উঠল। এত রাতে কে ফোন করল ! ফোন তুলতেই তার সেক্রেটারি ক্যারেন ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলল "তোমার এটা শোনা দরকার মনে হল, তাই বিরক্ত করলাম। আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি।" মিনিট খানেক কথা শোনার পর একটা কথাও না বলে স্টিভ ফোনটা কেটে দিলেন। এই সেই ল্যাবের মেয়েটা। চাকরী যেতে বসেছে বলে আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদেছে। স্টিভ আবার স্কচে মন নিবেশ করলেন। একটা অস্বস্তি হচ্ছে। শরীরটা কেমন যেন আনচান করছে। মেয়েটার কথাগুলো মিথ্যে হলে বেশ কিছু অর্থ জলে যাবে। কিন্তু যদি সত্যি হয়? স্টিভ হাতে ধরা স্কচের গ্লাসের দিকে খানিকক্ষণ মন দিয়ে দেখলেন। তারপর গ্লাস নামিয়ে রেখে ফোনটা তুলে নিলেন। খুব জরুরী কতগুলো ফোন করতে হবে।

ঘন্টা খানেক কেটে গেছে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর থেকে। পরী, দুরী আর কাজু ঘরের অর্ধেক আসবাব এনে ঠেসান দিয়েছে দরজার সাথে। প্রীতি ক্রমাগত যোগাযোগ করে চলেছে টীমের সাথে। ওদের আসতে এখনও ঘন্টা খানেক। উমা হঠাৎ

ভীষন ক্লান্ত আর অবসন্ন বোধ করছেন। তার আর কিছু ভাল লাগছেনা। তার শরীর আর চলছেনা। তিনি কোনোরকমে ঘরে ঢুকে খাটে শুয়ে পড়লেন। মৃত্তিকা তার পাশে এসে মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করল "মাসি, শরীর খারাপ লাগছে ? জল খাবে ?" উমা অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "ওরা যদি দরজা ভেঙে ফেলে কি হবে ?" মৃত্তিকার কাছে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। সে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখেছে। তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে না ফলপ্রসূ, তা সে জানেনা। ঠিক এই সময়েই তার মোবাইল ফোন বেজে উঠল। মৃত্তিকা ফোন টা রিসিভ করতেই অন্য দিক থেকে ভারী কণ্ঠস্বর বলে উঠল "মৃত্তিকা চৌধুরী ?"

"বলছি"

"আপনার পরিস্থিতি এখন কি রকম ? ওরা কি আবার এট্যাক করেছে ?"

"না, তবে যে কোন মুহূর্তে করবে। ওরা লোক জড় করছে।"

"কি মনে হয় কতক্ষণ সময় হাতে আছে আপনার ?"

"জানিনা। হয়ত এখনই আবার ওরা চেষ্টা শুরু করবে। শুধু একটা দরজা ভাঙার অপেক্ষা।"

"চিন্তা করবেন না। আমরা পৌঁছচ্ছি। আপনি এই কল'টা ডিসকানেক্ট করবেন না। আমাদের আপনাকে লোকেট করতে সুবিধা হবে।"

মৃত্তিকা ফোনটা হাতে নিয়ে উমার পাশে বসে পড়ল।

তারস্বরে কলিং বেল'টা বেজে উঠল। একবার, দুবার, তিন বার। তার পরেই প্রচন্ড জোরে দরজায় কেউ আঘাত করল। সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল সেই আঘাতে। আবার, আবার, আবার। দরজা কিন্তু ভাঙল না। এয়ার লক লাগানোর সময় অনেক টাকা খরচা করে কাজু সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিশেষ এক ধরনের পলিমারের আবরণ লাগিয়েছিল দরজার ওপরে। এই পলিমার অনেক বেশি ঘাতসহ। কাজু মনে মনে ঈশ্বর কে ধন্যবাদ দিল।

কলিং বেল টিপে নিজেকে জানান দেয়ার একটা মজা আছে। তারিক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আঁচ করতে পারছিল কি ভীষণ আতঙ্কে রয়েছে দরজার ওপাশের মানুষগুলো। বেরোবার রাস্তা নেই। খালি অপেক্ষা শেষ হয়ে যাবার। ওরা কাঁদছে, ঈশ্বরকে ডাকছে, বার বার ফোন করছে সাহায্যের জন্যে। কিন্তু কেউ আসবে না। এই শেষ হবার অপেক্ষার শুরু কলিং বেল বাজিয়ে। তারিক মনের মধ্যে গভীর তৃপ্তি অনুভব করল। কুড়ুল দিয়ে বার পাঁচেক কোপানোর পরেও দরজা ভাঙল না। তারিক দরজায় হাত দিয়ে দেখল অদ্ভুত মসৃণ আর পিচ্ছিল একটা আবরণ দরজার ওপর লাগানো আছে। কালু কুড়ুল টা নামিয়ে রেখে বলল "কি রকম যেন পিছলে যাচ্ছে, জোর পাচ্ছিনা।" তারিক টের পাচ্ছিল এভাবে হবে না। সে খানিক চিন্তা করে বলল "দরজা ছেড়ে দে, দেয়াল ভাঙ। কুড়ুল দিয়ে হবে না। শাবল নে।" কালু দরজার পাশের দেয়ালে শাবল দিয়ে প্রাণপণে মারল। এক ঘায়ে সিমেন্ট আর পাথর কুঁচি ছিটকে বেরিয়ে এল। কালু একের পর এক ঘা মেরেই চলল। সে হাঁপিয়ে গেলে আরেকজন। মিনিট কুড়ি বাদে তারিক খুশি হয়ে দেখল ইঁট খসে গিয়ে ঘরের ভিতর টা দেখা যাচ্ছে। এবার আরও কতক গুলো ইঁট খসানো নিয়ে কথা। তারপর ... আজ আর বিক্রি বাট্টা নয়। নিজে খাবে, দলের লোকদের খাওয়াবে, তারপর পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুন নিভিয়ে দেবে। দূরে একটা ফট ফট শব্দ হচ্ছে। শব্দ টা কাছে আসতে আসতে একদম মাথার ওপরে এসে হতেই থাকল। দেয়াল ভাঙা ছেড়ে ওরা সবাই সতর্ক হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। ওরা সংখ্যায় এখন দশ জন। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই। সিঁড়ির নীচে ছপ, ছপ শব্দ হচ্ছে জলের। কারা যেন ওপরে উঠে আসছে। কালু এই প্রথম বার হাতে পিস্তল পেয়েছে। সিঁড়ির নীচের দিকে তাক করে ঘোড়া টিপে দিল। প্রচন্ড শব্দ আর তারপর আবার সব চুপ চাপ। ওরা সবাই সিঁড়ির দিকে হাতিয়ার তাগ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখের কোণা দিয়ে সিঁড়ির ওপরে হঠাৎ একটা নড়াচড়া দেখে তারিক সেদিকে চোখ ফেরাল। একটা কালো মুখোশ পরা লোক তারদিকে একটা অদ্ভুত দেখতে অস্ত্র

তাক করে রয়েছে। তারিক আর কিছু দেখতে পায়নি। অটোমেটিক রাইফেলের একঘেয়ে শব্দ কয়েক সেকেন্ড পরেই থেমে গেছে।

ফ্লাইট এটেনডেন্টের কাছ থেকে গরম কফির কাপ দুটো নিয়ে সন্তর্পণে দুটো হোল্ডারে রেখে কাজু মৃত্তিকা কে ঠেলা দিয়ে জাগাল। "ওঠো, কফি খাও।" মৃত্তিকা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে কফির কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিল। একটু দূরেই পরী আর দুরী ঘুমিয়ে কাদা। তাদের দুজনের মাথা একে অপরের সাথে ঠেকে রয়েছে। তার পিছনের সিটে উমা আর তার পাশে হারুন। হাসান কাজুর পাশের সিটে। সবাই ঘুমোচ্ছে। কফির কাপে চুমুক দিয়ে কাজু জিজ্ঞেস করল "এবার বলতো, কি করে ম্যানেজ করলে? আমাদের বাঁচাতে কমান্ডো আসবে সে তো ভাবতেই পারি না! এতগুলো পাসপোর্ট, ভিসা, ফ্লাইট টিকিট এত কমসময়ে! ম্যাজিক না কি!" মৃত্তিকা হেসে বলল "এটা ডলারের ম্যাজিক। আমি স্টিভ কে ফোন করেছিলাম। আমি জানতাম যদি কেউ আমাদের বাঁচাতে পারে, তাহলে ওই পারবে।"

"কি বললে স্টিভ কে ?"

"আমি শুধু ওকে বলেছিলাম 'সুপার বাগ' এর প্রতিষেধক আমি খুঁজে পেয়েছি। আর সেই প্রতিষেধক চারটে মানুষের রক্তে মিশে আছে। তাদের কিছু হলে প্রতিষেধক চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যাবে। সময় খুব কম। স্টিভ লাভ-লোকসানের হিসেবে খুব দক্ষ। যদি 'সুপার বাগ' এর ওষুধ তৈরি হয় তাহলে সামনের দশ বছর আমাদের কোনো কম্পিটিটর থাকবে না। সেই লাভের তুলনায় এই খরচ তো নস্যি।"

"কিন্তু সত্যিই কি ওষুধ বানানো সম্ভব ?"

"হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি কনফিডেন্ট।"

"যাকগে, আমাদের মেয়েটা একটা সুপার মেয়ে হলেই হল, ওর মায়ের মত।"

"তাই হবে, আমি তো শুধু মাটি, আমার সবটুকু দিয়ে ও তৈরি, তাইত ও ধরিত্রী।"

রজত ভট্টাচার্য, নিভৃত সাহিত্যচর্চা আর দূর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ তাঁর ভালোলাগা। গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর গদ্যের অভিনব শৈলী বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়

মেজদার হোটেল

কমলকুমার মজুমদার – এক ইউরোপীয় ব্রাহ্মণকে ফিরে দেখা

হাওড়ার ছোট কারখানা ঘেরা সন্ধ্যেবেলা। তারমাঝে কদমতলা নটবর পাল রোডের মোড়ে মেজদার হোটেল। বহুদিন পরে মেজদার হোটেলে আবার আড্ডার জমায়েত হয়েছে। অনেকদিন পরে আবার কথায় কথায় সমরেশ বসুর লেখা এসে গেল। সমরেশ বসু বাজার চলতি বা মেইনস্ট্রিম সাহিত্য পত্রিকার শুধু উজ্জ্বল নয় সবচেয়ে পপুলার লেখক ছিলেন্ অথচ প্রবলভাবে ব্যতিক্রমী লেখক। সমরেশকে বাদ দিলে, পঞ্চাশের ষাটের সময়টায় মেইনস্ট্রিম গদ্যসাহিত্যে বিভূতি-সুবোধ-জ্যোতিরিন্দ্র-বুদ্ধদেবের উপস্থিতি প্রবল। তারাশঙ্কর ম্রিয়মান। মানিক গত হয়েছেন কয়েক বছর। তারও কয়েক বছর আগে বিভূতিভূষণ। মানিক কিন্তু স্টেজ থেকে বিদায় নিয়েও তাঁর দাপটের ঢেউ নিয়ে সিরিয়াস পাঠকদের মাঝে প্রবলভাবে বিরাজমান। মানিক ঘরানা গদ্যকাররা তখন বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে কত নিরাভরণ করেও সজীব রাখা যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এব্যাপারে, বামপন্থী ধারার দু'একজন ছাড়া বাকিরা খুব যে সফল হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। বরঞ্চ গৌরকিশোর ঘোষ, নিরাভরণ ভাষায় অনেকটা সফল ছিলেন। আর সমরেশের উল্টো প্রান্তে নাগরিক বা আর্বান বিদগ্ধমহলে তখন বুদ্ধদেব বসু মান্যতা পাচ্ছেন। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন একদম টিপিক্যাল অধ্যাপক সাহিত্যিক। বিলিতি কাচের সেগুন কাঠের ভিক্টোরিয়ান জানলা দিয়ে বাইরের জগৎ দেখেন।

কিন্তু সমরেশের দ্বিতীয় জগৎ বা কালকূট নামে যে সাহিত্যের জগৎ সেখানে তাঁর টেবিলের উল্টোদিকে কেউ ছিলেন না। তিনি একাকি বিরাজমান ছিলেন। প্রধানত কালকূট নামে যেসব লেখা বেরিয়েছে তার দুনিয়ায় উনি কোথায় পাঠক কে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ? কিছুটা বাঙলা-বিহারের জঙ্গলের দিকে চোখ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের-বিভূতিভূষণের উত্তরসূরি হিসেবে। কালকূটের বড়দিকটা কিন্তু শেকড়ের কাছে যাওয়ার রাস্তা। শহুরে মধ্যবিত্তকে বাঙলার চাষাভুষো মানুষের সংস্কৃতি ঐতিহ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া। সমরেশ জানতেন, বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্ম বেড়ে ওঠা সবই কলোনিয়াল নব্য আপার কাস্ট ছাঁচের মধ্যে। এই মধ্যবিত্তকে বাঙলার নিম্নবর্গের মানুষের সংস্কৃতির কাছে টেনে শেকড়ের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা। এখন যাদের আন্তোনিও গ্রামশির অনুসরণকারীরা সাব অলটার্ন বলেন সেই চাষাভুষো সমাজের লৌকিক ঐতিহ্যের আর সেই সমাজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন মেজদার দোকানের আড্ডা, শেকড় কাকে বলে, বাঙালীর শেকড় কি, সেদিকে গড়িয়েছিল। নিজের ঐতিহ্যর দিকে ফিরে দেখাকে বলতে কি বুঝবো ?

এতক্ষণ মেজদা দোকানের কাজে হেল্পিং হ্যান্ডদের সঙ্গে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হাত মুছতে মুঝতে বললেন, "বাঙালীর শেকড় কি ? সবাই কি একই শেকড়ের খোঁজে ঘোরে ?" সব বাঙালী এক শেকড়কে নিজের ঐতিহ্য ভাবে না। ধরো একজন আপার কাস্ট, পূর্ব বাঙলায় জমি বাড়ি ফেলে এসেছে। তার ফেলে আসা ধানের মরাই, চকমেলানো দুর্গামন্ডপ তার ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে ঐতিহ্যের স্মৃতিকে খুঁজছেন। আর যে অল্পবয়সী যুবক বা তরুণ, বর্ডারের বেরা টপকে এপারে এসে তপশিয়ার কোহিনুর মার্কেটে কাবাবে'র দোকানে কাজ করছে তার ঐতিহ্যে আছে ফেলে আসা নদীর পাড়-মাজার-মানিকপিরের গান। কিংবা পুরুলিয়ার যে ছেলেটা পেটের দায়ে বোম্বের ধারাভির ইডলির ট্রলি-দোকানে হেল্পারের কাজ করছে তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির শেকড় এক হতে পারে না। সে মোরাং বুরু, শিবের গাজন, ধর্মঠাকুরের মেলার মধ্যে তার স্মৃতির শেকড়কে খোঁজে।

আবার অনেক লেখক নিজের স্মৃতি নয়, নিজের চর্চিত জগতের মধ্যে দিয়ে অর্জিত স্মৃতি, পূর্বপুরুষের মুখের কথা বা ওরাল হিস্ট্রির মধ্যে ঐতিহ্যকে খুঁজেছেন। এ খোঁজা হারিয়ে যাওয়া মরা গাছের শেকড় খোঁজার মত। এইরকম স্মৃতির

জগতের উপন্যাসকার ছিলেন কমলকুমার। জটিল চিন্তার লেখক ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। ছোটগল্পে, প্রবন্ধে অন্যমানুষ ছিলেন। কিন্তু ঐতিহ্যের ইতিহাসের প্রশ্নে সমরেশের উল্টো প্রান্তে আছেন কমলকুমার মজুমদার। সমরেশ গেছেন বাঙলীর সংস্কৃতিকে চেনাতে, কমলকুমার তখন বাঙলার ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি সম্পৃক্ত জগতের শিল্পের মাঝে পাঠককে বাঙলা ঐতিহ্যকে চেনাতে চেয়েছিলেন। একটা কথা মনে রাখতেই হবে, সেটা হল বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্মই দেড়-দুশো বছর আগে। বা কলোনিয়াল সোশিও কালচারাল আঁতুড় ঘরে। কিন্তু তাঁদের আদি ইতিহাস ছিল স্মৃতিশাস্ত্র ভারাক্রান্ত আপার কাস্ট সংস্কৃতিতে। এই মধ্যবিত্তের বড় আশ্রয় রামকৃষ্ণ ভক্তি আন্দোলন। কমলকুমার এই মধ্যবিত্তকে তার ঐতিহ্যকে চেনাতে চেয়েছিলেন।

পরের দিনই আমাদের হাতে এসেছিল একটা ছোট্ট বই, লাল রঙের মলাট, বার করে বলেছিল, "এরকম বই আগে পড়িনি, তোমরা শোন। এই বলে থেকে রিডিং পড়তে শুরু করেছিল।"

"আলো ক্রমে আসিতেছে। এ নভোমণ্ডলে মুক্তাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বার আমরা, প্রাকৃতজনেরা, পুস্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।

অনতিদূরে উদার বিশাল প্রবাহিণী গঙ্গা, তরল মাতৃমূর্তি যথা, মধ্যে মধ্যে বায়ু অনর্গল উচ্ছসিত হইয়া উঠে, এই স্থানে, বেলাতটে বিবশকারী উদ্বিগ্নতা ক্ষুদ্র একটি জনমণ্ডলীকে আশ্রয় করিয়া আছে।"

উপন্যাসের নাম "অন্তর্জলী যাত্রা।"

একটি "নবাঙ্কুর" নামে অখ্যাত লিটল ম্যাগাজিনে "অন্তর্জলী যাত্রা" উপন্যাসটি বেরিয়েছিল, ১৯৫৯ সালে, কমলকুমারের বয়স তখন ৪৫।

উপন্যাসে প্রধান চরিত্র তিনটি। চণ্ডাল (ডোম বৈজুনাথ), গঙ্গা প্রাপ্ত হতে চলেছে এমন এক মৃতপ্রায় কুলীন ব্রাহ্মণ ও নবযৌবনা ব্রাহ্মণ কন্যা, যশোমতী। যশোমতীর সঙ্গে মৃতপ্রায় গঙ্গাযাত্রী কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়, গঙ্গাতীরে। যশোমতীর পিতার কুলরক্ষার্থে। সহমরণ সতীদাহ কথা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। সময়কাল ১৮৩০-৫০ সালের কোন এক সময়ের গন্ডগ্রাম, যেখানে ফোর্টউইলিয়াম-হিন্দু কলেজ ঘরানার নব্যবঙ্গের আঘাত পড়েনি। যদিও সহমরণ যে সরকার বাহাদুর আইন করে বন্ধ করেছে, সে খবর এই গ্রামে পৌঁছেছে। স্থান গঙ্গা তীরবর্তী মহাশ্মশান।

সেদিন সেই শহরতলীর সন্ধ্যেবেলায় মেজদার হোটেলের ডুম আলোর তলায় আমরা কমল মজুমদার নামক ঘূর্ণাবর্তে ঢুকেছিলুম।

আখ্যানের মাঝপথে এসে বোঝা যায় পাঠক হিসেবে আপনি অন্তর্জলী যাত্রা গোটা উপন্যাসটি বা আখ্যানটিতে প্রচলিত realism বা গল্প বলার structure নেই। অথচ কোনো কোনো ঘটনার আশ্চর্যময় details পাবেন।

যশোমতী ঐতিহ্যবাহী প্রথার প্রতি নিঃশর্তে শ্রদ্ধাশীলা। সহমরণে সম্পূর্ণ সম্মত ও স্থিত । অন্যদিকে স্বাভাবিক জীবনের নিয়মে যশোমতী, বৈজুর বীর্যবান শরীরের দিকে আকৃষ্ট। যশোমতী যখন নিজেকে সহমরণের প্রার্থিনী ভাবছে, কমলকুমারের ভাষায় তার রূপকল্প গড়ে উঠছে – "যশোমতীর দৃষ্টিপথে, মানস চক্ষে সতীদাহ অনুষ্ঠান ভাসিয়া উঠিল। . . . চতুর্দোলার আসনে যজ্ঞবাট করা হইয়াছে, চারিভিতে ছোঁড়া কদলীবৃক্ষ লাল সুতা দিয়া গণ্ডীবদ্ধ, উপরে মালাকার মেঢ় ঝুলাইতে ব্যস্ত, প্রতিটি মেঢ়ে দশমহাবিদ্যার এক এক রূপ আলেখ্য, শেষ কয়েকটি মালাকারের ছেলেরা আঁকিতেছে, তাহাদের বধূরা ফুলমালা গাঁথে, ধান্য কঙ্কন, খৈয়ের সাত নহর তৈয়ারি হয়। . . . সিন্দুর বিক্রেতা গেরী মাটিতে লা মিশাইয়া ভাটি বসাইয়াছে। নূরীরা রুলী গড়ে, তাঁতিরা এবং কাপালিরা সূতা কাটিয়া আলতায় রঙ করিতেছে, ছুতার আপন মনে তুলসিমালা গাঁথিতে ব্যস্ত; বাটাদার কড়ির পাহাড় করিয়াছে; লোয়াদার বাতাসাওয়ালারা একদিকে বাতাসা কাটিতেছে। . . .

অভিজাত গৃহের রমণীরা তাঁহাকে সাজাইতে ব্যস্ত, তাঁহারা আপন আপন গৃহ হইতে প্রসাধন সামগ্রী আনিয়াছেন, গোলাপ-পাশে সূক্ষ কারুকার্য, দর্পণের পিছনে কলাইকৃত প্রসাধনরত রাধা প্রতিমা, জড়োয়া সুখপক্ষী অঙ্কিত কাজললতা। স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে তাঁহাকে উম্মল-পানি দেওয়া হইতেছে, তিনি সহাস্যবদনে তাহা পান করিতেছেন, এবং তাহাঁর চক্ষু আরক্ত। নিকটে বন্ধ-চিত্র জাঁতি দিয়া একজনা গুবাক কাটিতেছেন। জাঁতির সুরত ক্রীড়ারত স্ত্রী-পুরুষের হেবজ্র হাস্য, যশোমতী ইদানীং সাক্ষাৎ চম্পক ঈশ্বরী। তিনি যেন লক্ষ্মীমূর্তি, এক হস্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, কখনও বা দেখিলেন পঞ্চ পল্লব অন্য হাতে বরাভয়। কত যে শাখা তাহাঁর পায়ে লাগিতেছে, সিন্দুর পড়িতেছে। তিনি দৌড়াইয়া চিতায় উঠিলেন . . . অগ্নি সংযোগ করা হইল, শাঁখা কড়ি স্বর্ণালঙ্কার উড়িল। . . . যশোমতী নিজেকে রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার দড়ি যোগান দেওয়া শ্যামা মা ভাবে (ভাবিষ্ট)।"

ইচ্ছে করেই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দেওয়া হলো, কমলকুমারের সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে। সহমরণের এরকম ডিটেল বর্ণনা পাঠক এর আগে পাননি। এমনকি মহাভারতে মাদ্রীর সহমরণের বর্ণনাতে এত ডিটেল পাওয়া যায় না। কমলকুমার তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, কল্পনার ক্ষমতা এবং নিজস্ব ভাষা নিয়ে হাজির হলেন। পাঠক লক্ষ্য করেছেন, ভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর আবেশ তৈরির আধার হয়ে উঠেছে। অথচ সমগ্র রূপকল্পটিতে অবধারিত ভাবে চলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির দুই দিককে দেখার জন্য কি ? একদিকে সংস্কৃতিজ্ঞ প্রাচীন প্রথা। অপর দিকে ব্রাহ্মণীজগতে প্রাকৃত বা সাবেকী বাংলার প্রতিনিয়ত প্রচলন। এই দুয়ের সমান্তরাল ব্যবহার, ভাষায় এক মন্থন সৃষ্টি করেছে। কমলকুমারের বিদেশী সাহিত্যের বা সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে নিবিড় ওয়াকিবহাল থাকার এ এক চিহ্ন। তিনি পুরাতন জাতিকে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে, ধরতে চাইছেন। অনেক সময়েই বিভক্তির ব্যবহার নেই। নাম ধাতু ব্যবহারের চেষ্টা অবিরত। এ লেখা যত্নশীল পাঠকদের জন্যে। সপ্তমী কি নবমী পূজার দিন ভাত-ঘুম পরবর্তী বাজারি শারদীয়া উপন্যাস পড়ুয়াদের জন্য নয়। আরো একটি উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেল। সহমরণকে উচ্চবর্ণজাত প্রথাকে রোম্যান্টিক মোড়কে পেস করা হল। সহমরণের সোশ্যাল ইকনমিকস সযত্নে অবহেলা করা তো হলই। বীভৎসতা ও কদর্যতাকে এক পৌরানিক স্বপ্নিল প্রথায় পরিবেশিত হল। এবং "কমলকুমার"- এই মিথটি গড়ার ছাচটিও তৈরি হলো।

অথচ এই আখ্যানে বৈজু চাঁড়াল (ডোম শব্দ তখন পাইক বরকন্দাজদের জন্য ব্যবহার হত) প্রবল ভাবে তাঁর নিচুতলার ভাষা নিয়ে উপস্থিত। পাঠক লক্ষ্য করবেন, বৈজুকে realistic করেননি। একটি কারণ হতে পারে চাঁড়াল সমাজের ওপর তাঁর অভিজ্ঞতা কম ছিল। আবার অন্য ভাবে দেখলে বোঝা যায় এই উপন্যাসে Classical European নভেলের structure বা বিন্যাসকে পরিহার করা হয়েছে। এ যেন গদ্যে কৃষ্ণলীলার বা পুরান-কবি-কাহিনীর স্টাইল নেওয়া হয়েছে। এমনকি কবিকঙ্কণী লোক-ধার্মিক রিয়ালিজম কেও পাশ কাটানো হয়েছে। লেখায় structureএ নিজের সীমাবদ্ধতাকে সুন্দর ভাবে উহ্য রাখা হয়েছে। ফলে সীমাবদ্ধতাকে স্বাভাবিক মনে হয়। সেদিন সন্ধ্যেবেলা অনেকদিন পর আমরা রিডিংপড়ার-রিডিং শোনার মধ্যে দিয়ে কমলকুমার মজুমদারের অনাস্বাদিত জগতের কাছে এসেছিলুম। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলুম পঞ্চাশ ষাটের দশকে সমরেশ বসুর উলটো জগতের এক বড়মাপের গদ্যকার ছিলেন কমলকুমার। যদিও সমরেশ বসুর সঙ্গে তুলনা হয়না। কলকাতার সাহিত্যজগতের প্রধান ধারার অন্যতম বড় খুঁটি ছিলেন সমরেশ। মেইনস্ট্রিম বাজারের প্রধান খুঁটি। প্রতি পুজোসংখ্যায় একাধিক উপন্যাস ছাড়াও নামকরা লিটল ম্যাগাজিনদেরো সমরেশ খুশী রাখতেন। সারা জীবনে সমরেশ এবং কালকূট নামে আড়াইশোর মত উপন্যাস তাঁর ক্ষেতে ফলেছে। আর কমলকুমার কোনদিন মেইনস্ট্রিমের জন্যে লেখেননি। খাঁটি লিটল ম্যাগাজিন লেখক ছিলেন। সমরেশের মত কখনই সাহিত্য জীবনধারণের উপায় বা পেশা হিসেবে নেননি। এছাড়া পন্ডিত মানুষ হিসেবে অনেক বেশি পরিচিতি লাভ করেছিলেন, ফলে প্রাবন্ধিক হিসেবেও অনেক লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের আবদার – অনুরোধ মিটিয়েছেন। তাও সাকুল্যে তিন ভল্যুমে সব লেখা ধরে গছে। অথচ এই সময়টা যখন সুনীল শীর্ষেন্দু প্রবল বন্যা হয়ে বাংলা গদ্যে আসিন। তখন সাধারণ পাঠকের কাছে সমরেশ, মেইনস্ট্রিমের তন্নিষ্ঠ পাঠকের কাছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আর লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকের কাছে কমল মজুমদার। এরকম একটা মিথ কলেজ স্ট্রিট জন্ম দিয়েছিল। সমরেশের সঙ্গে পার্থক্য ছিল আরো গভীরে। সমরেশ ছিলেন সামাজিক জগতের চিত্রকর।

ঐতিহাসিক উপন্যাসেও অর্থনীতি, সামাজিক ইতিহাস এসেছে। অন্যদিকে কমলকুমার প্রাচীন পুরান-ইতিহাসকে লেখার উপজীব্য করেছেন।

পঞ্চাশের যে আবহাওয়ার কথা শুরুতে আমরা আলোচনা করছিলুম সেই বাজারের মাঝে, নবাঙ্কুরের মত একটি অখ্যাত পত্রিকায় "অন্তর্জলী যাত্রা" বেরিয়েছিল। "নবাঙ্কুর" হারিয়েও গেছে বহুবছর আগে। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কিংবা পাঠক সমাজে উপস্থিত হওয়া (আজকের ভাষায় arriving) হয়নি। অল্প কিছু বিদগ্ধ মানুষ, মননশীল পাঠক আস্তে আস্তে এই উপন্যাস সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা শুরু করেছিলেন। কমলকুমার কিন্তু অখ্যাত অনামী ছিলেন না। কলকাতার সুধীমহলে, intellectual জগতে এক উজ্জ্বল উপস্থিতি তাঁকে অতি পরিচিত করে রেখেছিল। কমলালয় স্টোরস, কফি হাউস বা খালাসীটোলায় নিয়মিত আড্ডায় সত্যজিৎ রায় থেকে সিগনেট প্রেসের দিলীপ গুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত থেকে অশোক মিত্র (ICS) ইত্যাদিরা উপস্থিত থাকতেন। এই সমাবেশে তিনি মধ্যমণি হয়ে থাকতেন। সর্বত্র তিনি মুখ্য ভূমিকা নিতেন। ফলে তাঁর লেখা শারদীয়া আক্রান্ত জনগণের নজর না কাড়লেও, একটু ধীরে হলেও, বিদগ্ধ তন্নিষ্ঠ পাঠকমহলে স্বীকৃতি পেতে সফল হয়।

অনিমেষ সত্তরের দশকে ছাত্রজীবন কাটিয়েছে। ওই দশকের ভালো খারাপ সবই তার মধ্যে আছে।বর্তমানে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকতে চায়। সাহিত্য,সামাজিক ইতিহাস-অর্থনীতির প্রবন্ধ আর ছোটগল্পর জগতে বিচরণ করতে চায়।

এক বাক্স চকলেট

সুজয় দত্ত

ধুলো রংয়ের বিকেল

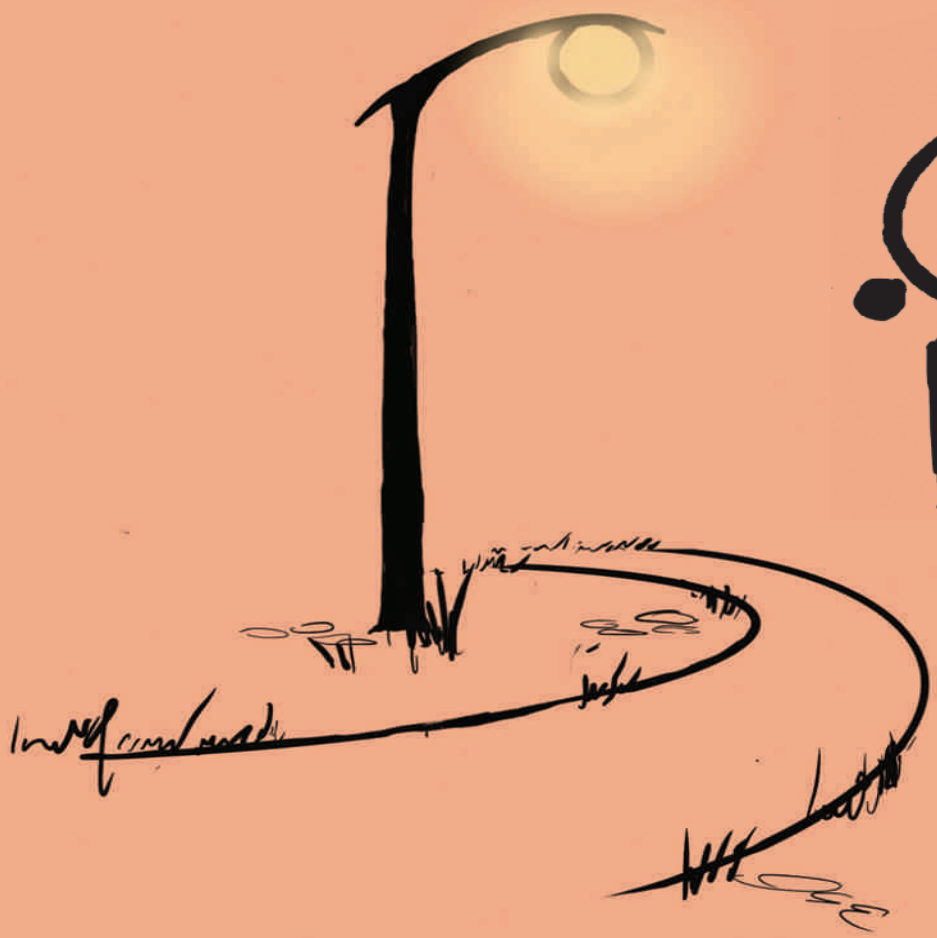

সঞ্জয় চক্রবর্তী